Ke Hotyakari by Shibram Chakraborty

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

শিবরাম চক্রবর্তী

কে হত্যাকারী

প্রথম কিস্তি : রহস্যময় খুন

দৈনিক বিশ্ববার্তার মফস্বল-সংস্করণ তখন ছাপা হচ্ছিল। বিরাট মুদ্রাযন্ত্রের গহ্বর থেকে প্রতি মিনিটে পাঁচ হাজার করে কপি উদ্গীরিত হচ্ছে। কোন আশ্চর্য কৌশলে অতগুলি করে কপি আপনা থেকেই এপিঠে ওপিঠে ছাপা হয়ে, ভাঁজ হয়ে থাকে থাকে সজ্জিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে আসছিল বাহাদুররাই তা বলতে পারেন।

প্রায় তিন মাইল পরিমাণ কাগজে প্রাত্যহিক বিশ্ববার্তা ছাপা হয়। কাগজগুলি পাশাপাশি ছড়িয়ে রাখলে তিন মাইল পরিমিত জায়গা জুড়ে বসবে। কিন্তু আসলে, ওই তিন মাইল কাগজ তিন মাইলের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সারা ভারতবর্ষে (কত হাজার মাইল কে জানে!) ছাড়িয়ে যায়। প্রত্যেকেই আমরা প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গে বিশ্ববার্তা পড়ি, নতুবা চায়ের আস্বাদ পাই না।

বিশ্ববার্তার বাড়িটিও একটা যা-তা নয়। ঠিক তিন মাইল ব্যাপী না হলেও, তিনতলা জুড়ে বড় বড় ত্রিশখানি ঘরে বিস্তারিত। কলকাতার কোনো এক নামজাদা রাজপথের ওপরেই এর কার্যালয়। এবং বলা বাহুল্য, বিশ্ববার্তার দৌলতেই রাস্তার এই নামডাক।

তুমি যদি বিশ্ববার্তার গহ্বরে কখনও প্রবেশ লাভ কর তা হলে দেখবে সবাই সেখানে শশব্যস্ত। দেউড়ির দারোয়ান থেকে শুরু করে ভেতরের কর্মচারীরা, কম্পোজিটাররা, সংবাদদাতারা, বিজ্ঞাপনদাতারা—সকলেই সর্বদা ইতস্তত ধাবমান। সদরে অন্দরে সমান দৌড়ঝাঁপ। এমনকি, কাগজ ছেপে বেরুতে-না-বেরুতে হকাররা বগলদাবা করে নিয়ে দৌড় মারছে, তাও তুমি দেখতে পাবে। নিদারুণ কেনবার ইচ্ছা হলেও, তাদের কাউকে দাঁড় করিয়ে এক কপি কিনতে পারবে কি না সন্দেহ।

উঃ, এত লোক কাজ করে বিশ্ববার্তায়! আর এতজন সেখানে যাতায়াত করে কাজে-অকাজে, ভাবলে আকুল হতে হয়। ধরো, তাদের সবাইকে যদি সারবন্দি দাঁড় করিয়ে দেয়া যায় (অবিশ্যি, এভাবে দাঁড়াতে তাঁরা সহজে রাজি হবেন না), তা হলে সেই লাইন খুব সম্ভব সুন্দরবন ঘুরে আসবে। দুই লাইনে খাড়া করলে তার ডবল জায়গা ঘেরাও হতে পারে। আর যদি শোভাযাত্রা করে বার করা যায়, তা হলে ঢাকুরিয়া লেকের মাঝবরাবর গিয়ে পৌঁছবে। এতদ্বারা অধিকাংশ নাগরিককে জলাঞ্জলি দিতে হয় বলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এই শোভাযাত্রার সম্ভবত অনুমতি দেবেন না। কিন্তু, তা না দিলেও, এতেই ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো তা হৃদয়ঙ্গম হবে।

এই মুহূর্তে এই বিরাট অট্টালিকায় কী দারুণ হইচই! এই মুহূর্তে বলেই

www.MurchOna.com
suman_ahmed@yahoo.com

নয়—এটা প্রতিমুহূর্তের ব্যাপার। দিনেরাতে কখনও একটুক্ষণের জন্যও বিশ্ববার্তা-কার্যালয় চুপচাপ রয়েছে একথা ভাবতে পারা যায় না। তবে ঘরে ঘরে কর্ম-কোলাহল চললেও একটি ঘর নীরব, একদম ঠাণ্ডা। সেই ঘরটি বিশ্ববার্তার বড়কর্তার ঘর। যাঁর বুদ্ধিবলে এবং কর্মফলে বিশ্ববার্তা আজ বিশ্বের প্রায় সবচেয়ে বড় বার্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশ্ববার্তার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে যাঁর বিরাট স্কন্ধে সেই থরহরি দত্তর ঘরটিই কেবল চুপচাপ।

সারা বাড়িটিকে, বাড়ির সবাইকে এবং সবকিছুকে কম্পমান করে রাখলেও থরহরি নিজে নিষ্কম্প। শুধু নিষ্কম্প নন, নিবাত-নিষ্কম্প। বাত তিনি খুব কমই বলেন, খুব কম লোকের সঙ্গেই বলেন। তাঁর মধ্যে কোনো ব্যস্ততা কোনো চাঞ্চল্য নেই। তাঁর বিরাট দেহ দেখলে মনে হয় সত্যিই তিনি বিরাটদেহ। এবং মুখভাব দেখলে মনে হয় তাঁর মাথার ভেতরে যে বিরাট মস্তিষ্ককে তিনি অকাতরে বহন করেছেন তা চারটিখানি না। কাজেই, উন্নত লোকেরাও যে তাঁর কাছে এসে সহজেই অবনত হয়ে পড়বে তার আর বিচিত্র কী? তবে তাঁর মুখভাব দেখে তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করা কারও সাধ্য নয়।

বড়কর্তা নিজের প্রকাণ্ড চেয়ারে বসে ছিলেন। আর তাঁর টেবিলের চারধারে কাগজপত্রের ছড়াছড়ি। তাঁর ওই টেবিলের ওপর দিয়েই বিশ্বের সমস্ত বার্তা বয়ে চলেছে—যেসব বার্তা সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রাকরদের দ্বারা মুদ্রিত, হকারদের দ্বারা হকৃত হয়ে বিশ্ববার্তারূপে পুনশ্চ আবার প্রবাহিত হবে। কিন্তু চেয়ারের ওই মানুষটিকে সরিয়ে নাও, দেখবে বিশ্ববার্তা অচল ; এমনকি আমাদের বিশ্বও অচল বলে তোমার ভ্রম হবে।

এই সময়ে আমাদের গল্পের যবনিকা উন্মোচিত হতে দেখা গেল (এর আগে এই যবনিকা উন্মোচনের কোনো অর্থ ছিল না)—দেখা গেল যে বড়কর্তা কী-একটা সংবাদ গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ করছেন।

তার-বার্তা, বেতার-বার্তা কিংবা টেলিফোন-বার্তা নয়, এক টুকরো কাগজে হাতেলেখা একটা খবর। কিন্তু চোখ বুলোতেই চকিতের মধ্যে তিনি সংবাদের মর্ম বুঝতে পেরেছেন বলে বোধ হল।

"কী সর্বনাশ!" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

এর চেয়ে বেশি কথা—তীব্রতর ভাষা থরহরির কণ্ঠ থেকে কেউ কখনও শোনেনি। এই নিরেট, আত্মনিষ্ঠ, স্বয়ংসৃষ্ট মানুষ এর অধিক বাক্যব্যয় খুব কদাচই করেছেন। এর চেয়ে বেশি লম্বা এবং বেশি শক্ত কথা তাঁর মুখ থেকে খসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্যাদাহানি ঘটত।

"কী সর্বনাশ!" তিনি পুনরুক্তি করলেন : "কৃত্তিবাস খুন হয়েছে! নিজের বাড়িতে! কী আশ্চর্য, কাল রাত্রে যে একসঙ্গে আমরা খেলাম! আমি তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি আমার মোটরে!"

"তুমি যেতে পার।" সংবাদদাতাকে তিনি বললেন। তার পরে টেলিফোনটা হাতে নিয়ে (একটুও চিন্তা না করে তিনি টেলিফোনের চোঙ হাতে নিতে পারতেন, এমনকি চিন্তা করতে করতেও টেলিফোন করার তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল)—চোঙটা হাতে নিয়ে, ঠাণ্ডা, গলায়, কাটাকাটা কথায়—একটিও কথা বাজে বরবাদ না করে বলতে শুরু করলেন :

"হ্যালো, অপারেটর! পুট্ মি থ্রি টু—টু টু ফোর। হ্যালো! কে? দুই দুই চার? হ্যালো, দুই দুই চার? কান্তিকুমার মিত্রকে আমি চাই। কান্তিই কথা বলছ? ওঃ,

কান্তি! আমি থরহরি। কাশীপুরে একটা খুন হয়েছে—এক বাগানবাড়িতে। কৃত্তিবাস সেনের বাড়ি। কৃত্তিবাস নিজেই নিহত। তুমি সেখানে চলে যাও—চট করে এক্ষুনি। এই খুনের রহস্য তোমাকে উন্মোচন করতে হবে। যত টাকা লাগে ব্যয়ের কোনো কার্পণ্য কোরো না। বিশ্ববার্তা তোমার পেছনে রয়েছে। গাড়ি ভাড়া আছে তো তোমার কাছে? বেশ, বেরিয়ে পড়ো তা হলে।"

রিসিভারের চোঙ যথাস্থানে রেখে তার পরমুহূর্তে বড়কর্তা ঘূর্ণি-চেয়ারের আরেক ধারে ঝুঁকে পড়লেন (এই চল্লিশ ডিগ্রি আন্দাজ)—ঝুঁকে পড়ে তারযোগে আরাকানের যেসব বার্তা এসেছিল—নিজস্ব এবং পরস্মৈপদী সংবাদদাতাদের প্রেরিত, সেইসব সংবাদে মনোযোগ দিলেন। কৃত্তিবাসকে তিনি আর চিন্তায় স্থান দিলেন না।

তাঁর কাজ করার ধরনই এই। বোধহয় সব বিরাট ব্যক্তিরই ধরনধারণ এইরকম।

দ্বিতীয় কিস্তি : খুনের কিনারায়

খুনের কিনার করা তো ঢের পরের কথা, কিন্তু খুনের কী মতলব তা-ই জানতে হলেও আগে তার কিনারায় গিয়ে পৌঁছনো দরকার। লাশের কাছে এবং আশেপাশে অপরাধীর নানান নিশানা সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে ছড়ানো থাকে—সন্ধানী নজরের অপেক্ষায়। কান্তিকুমারের গোয়েন্দাসুলভ সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। কান্তি গোয়েন্দা নয়, কিন্তু অনেক গোয়েন্দার কান কাটে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কান্তিকুমারকে একটা মোটরে উপবিষ্ট হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে কাশীপুরের দিকে ছুটতে দেখা গেল। গ্রে স্ট্রিটের মোড় পেরুতে-না-পেরুতেই তার কানে এল, হকাররা হাঁকছে : "কাউন্সিলার খুন! বিশ্ববার্তা টেলিগ্রাম পড়ুন বাবু! আরেকজন কাউন্সিলার খুন!"

গাড়ি থামিয়ে দুটো পয়সা ফেলে দিয়ে এক পাতার একখানা টেলিগ্রাম কান্তিকুমার কিনেছে। গাড়িতে বসেই দুর্ঘটনার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে একবার।

কৃত্তিবাস সেন নামজাদা একজন কাউন্সিলার। তাঁর গঙ্গাতীরবর্তী বাগান-বাড়িতে কে বা কাহারা তাঁকে খুন করে রেখে গেছে। যেসব লক্ষণ দেখা যায় তাতে খুন বলেই সন্দেহ হয়—এমনকি, লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখলেও খুন ছাড়া আরকিছু মনে হয় না। কর্পোরেশনের এই হতভাগ্য কাউন্সিলার মৃত্যুকালে বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিলেন—দেখলে বেশ ধারণা হয় মৃত্যুর জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আগে যে তিনি বিলিয়ার্ড খেলেছেন এরূপ ধারণা করাও খুব কঠিন নয়। বিলিয়ার্ড-ঘরে চিতপাত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া গেছে—তাঁর একটা পা বিলিয়ার্ড-টেবলের এক পায়ায় ঠেকানো। একটা চটকার কাপড়ের টুকরো যদ্দূর মনে হয় তাঁরই নিজের রুমাল, তাঁর গলায় পাক দিয়ে জড়ানো—সেই রুমালের সঙ্গে আটকানো আবার বিলিয়ার্ডের কিউ। তাঁর সারা মুখে প্রশান্ত হাসি। অদ্ভুত এক প্রসন্নতা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়েই তাঁর অবসান ঘটেছে। তাঁর দেহে দুটি গুলির গর্তও দেখা যায়,

প্রত্যেক দিকে একটি করে—দেহের ভেতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেছে মনে হয়। তার ওপরে আবার পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙা। তাঁর হাত দুটি স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইলে বুকের ওপরে বিন্যস্ত! এক হাতের মুঠোয় এখনও পর্যন্ত বিলিয়ার্ডের একটা বল ধরা। ঘরের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি মারামারির কোনো চিহ্ন নেই—যাবতীয় আসবাপত্র যে যার যথাস্থানে—কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটেনি। কেবল পরিধেয় বস্ত্র থেকে চৌকো একটা ফালি অন্তর্হিত হয়েছে।

বিশ্ববার্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই খুনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। পত্রিকা বলছেন এই নিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনটি কাউন্সিলার মারা পড়ল। এইভাবে কাউন্সিলার মারা পড়লে, এই জাতি, মানে এই কাউন্সিলার জাতি আর কতদিন টেকসই হবে? অকারণ কোনোরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা তাঁদের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তা না হলেও, তাঁদের মতে এই কাউন্সিলার হানির আশু অবসান ঘটা উচিত। প্রত্যেক জিনিসেরই একটি সীমা আছে, যুক্তিসঙ্গত সীমা। এমনকি কাউন্সিলার-মড়কেরও। খামাখা কেন একজন কাউন্সিলার খুন হবে?

আবশ্যি, প্রশ্ন উঠতে পারে কাউন্সিলারদের বেঁচে থাকারই-বা কী দরকার? তাদের বেঁচে থেকে—বাঁচিয়ে রেখেই-বা কী লাভ? কিন্তু এ-প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। তারা বেঁচে থাকে। বেঁচে-বর্তে থাকতে দেখা যায় তাদের—অত্যন্ত স্বভাবতই! এমনকি, সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে, জনসাধারণের কাছে, সমাজের কাছে, কাউন্সিলারের দাবি এমন কিছু বেশি নয়। এমন কিছু বেশি তারা চায় না যেজন্য তাদের এভাবে অপসারণ করা আবশ্যক। কী চায় তাঁরা? মাঝে মাঝে একটু তোয়াজ, কখনও ঘুস, এবং সময়ে-অসময়ে ভোট। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। এর জন্যই কি তাদের ধরে ধরে খুন করতে হবে? এইভাবে কাউন্সিলার-খতমের দ্বারা কলকাতার যে লাভ হয় তা কি কর্পোরেশনের ক্ষতির তুলনায় ওজনে কিছু ভারী? সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

ইত্যাকার চুলচেরা খতিয়ে বিশেষ সংস্করণ বিশ্ববার্তার সম্পাদক এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এই ধারায় কাউন্সিলারের বিয়োগ চলতে থাকলে, আর এক জেনারেশনের (কিংবা ডিজেনারেশনের) মধ্যে আর একজন কাউন্সিলারেরও আর অস্তিত্ব থাকবে না। মিসিং লিঙ্কের মতো এরাও লোপ পাবে। এই জীবদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কি আমাদের সকলেরই সমবেতভাবে তৎপর হওয়া উচিত নয়—এই প্রশ্নে তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যের তিনি উপসংহার করেছেন।

কান্তিকুমার মিত্র গোয়েন্দা নন, বলেছি আগেই। কান্তিকুমার রিপোর্টার। বিশ্ববার্তার স্বকীয় বিশেষ সংবাদদাতাদের মধ্যে তিনি বিশেষত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠদ্দশা সাঙ্গ করে বিশ্ববার্তার কার্যালয়ে তিনি চাকরি নিয়েছেন—এই দুমাস। কিন্তু দুমাসের মধ্যেই তিনি উন্নতির চূড়া থেকে চূড়ান্তরে উঠেছেন। কাজ নেয়ার প্রথম সপ্তাহেই তিনি এক গুরুতর সমস্যাভেদ করেন : পাটের বাজার থেকে পাট লোপাট হওয়ার সমস্যা। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের কেলেঙ্কারি তিনি প্রকাশ করে দেন। তৃতীয় সপ্তাহে এই শহরের কতিপয় গণ্যমান্য নাগরিকের কুকীর্তি লোকচক্ষে তিনি অনাবৃত করেন। তার পর থেকে, জটিল কুটিল যেখানে যা-কিছু সমস্যামূলক হয়ে রহস্যভেদের অপেক্ষায় আছে সে-সমস্তর

ভার বিশ্ববার্তার দপ্তর থেকে তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব এই খুনের কিনারা করার হেতু বিশ্ববার্তার বড়কর্তা থরহরিবাবু যে কান্তিকুমারের স্কন্ধে নির্ভর করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

কান্তিকুমার অচিরেই খুনের কিনারায় এসে পৌঁছলেন। গঙ্গার ওপরেই প্রকাণ্ড ইমারত—বড় রাস্তার ওপরেই। এধারে রাস্তা—ওধারে গঙ্গা। কান্তিকুমার দেখল, পুলিশ চারধার ঘেরাও করে ফেলেছে। সেই ঘেরাওয়ের এখানে-ওখানে ইতস্তত অলস কৌতূহলীর দলে জোড়ে বিজোড়ে দু পাঁচ সাতজন জড়ো হয়ে গুলতানি পাকাচ্ছে। চারধারেই পাহারাওলা। তাদের মুখের চেহারায় যেন এই প্রশ্ন দেগে দেওয়া—অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি? কীরূপ যেন একটা হতভম্ব মুখভাব—যা কেবল পুলিশের মুখেই দেখা যায়। সাধারণ পাহারাওলার মধ্যে পুলিশ কর্মচারীরও অভাব ছিল না। তাদের একজন বলছিলেন, "এই ব্যাপারের পেছনে নিশ্চয়ই একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে, কিন্তু তা যে কী, আমি আন্দাজ করতে পারছিনে।"

অপর ব্যক্তির জবাব শোনা গেল, "আমিও ভাই তথৈবচ।"

তৃতীয় কিস্তি : পুলিশের আক্কেলগুড়ুম

থানার বড়দারোগা, তাঁর চেহারাখানাও বেশ বড়। লম্বা-চওড়া রাজ-সংস্করণের চেহারায়—চোখেমুখে কোটালসুলভ কৌটিল্য, সাধারণত বড় দারোগাদের মধ্যে যেমনটি দেখা যায়। এই লোকটিই কি সেই লোক যাঁর ঘোষণা আমরা যেখানে, সেখানে যখন-তখন দেখেছি—শহর আর শহরতলির আনাচে-কানাচে যাঁর সজাগ দৃষ্টি সর্বদা পাহারা দিচ্ছে? যে সতর্ক দৃষ্টি ঠগি আর বদমাইশদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে দ্বিধা বোধ করছে না—আমার মারা যাবার পরে? না, বোধহয় তিনি নন।

বাড়ির সামনের একটা সরকারি ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দারোগা। কান্তিকুমারকে দেখে তিনি গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন।

"কী? আক্কেলগুড়ুম নাকি, আদ্যনাথ?" কান্তিকুমার জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, কান্তি। আবার আমার আক্কেলগুড়ুম।" জবাব দিলেন বড়দারোগা ওরফে আদ্যনাথ। তাঁর কণ্ঠস্বর সজল বলে বোধ হল। "আমার ধারণা ছিল এটার আমি কিনারা করতে পারব, কিন্তু এবারও আমি কোনো কূল পাচ্ছি না।"

আদ্যনাথ রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছবার ছলনায় চোখের কোণ দুটো মুছে নিল।

"এই নাও সিগ্রেট।" বলল কান্তি : "এখন বলো তো ব্যাপারখানা কী? শুনি আগাগোড়া রহস্যটা—কোথায় দুর্ভেদ্য হয়েছে দেখা যাক।"

সিগ্রেট পেয়ে আদ্যনাথবাবুর চেহারা আরও উজ্জ্বল বোধ হল। চোঁর-ছ্যাঁচড়রা যেমন ঘুসি পেলেই খুশি হয়, পুলিশের লোকরা তেমনি কোনো না কোনো প্রকারের ঘুশ না পেলে তুষ্ট নন এদিক দিয়ে তাঁরা দেবতাদের প্রায় সগোত্র, এইরূপ শোনা যায়।

সিগ্রেট উপহারলাভে আদ্যনাথের উৎসাহ দেখা দিল।

"বলছি সব।" বললেন তিনি : "দাঁড়াও, বাজে লোকগুলোকে আগে বিদেয় করে আসি।"

এই বলে, একজন পাহারাওলার কাছ থেকে মোটা একটা লাঠিনা-কেড়ে নিয়ে কৌতূহলী জনতাকে তিনি তাড়া করলেন। দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, চারে পাঁচে, জোড়বিজোড়ে ইতস্তত যেসব ছোটখাটো জনতা জমেছিল, সেই তাড়নায় বাত্যাতাড়িত জঞ্জালের মতো ইতোনষ্ট হয়ে স্ততোভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। এখান থেকে সরে ওখানে গিয়ে জমল। সেখান থেকে নড়ল না। নড়বে কেন? কথায় বলে খুনখারাপি। খুনের সঙ্গে সঙ্গে খারাপিরা লেগেই থাকে।

"ওসব খারাপ লোকদের ছেড়ে দাও।" বলল কান্তিকুমার : "এখন কাজের কথা বলো। পদচিহ্নের খবর কী?"

কান্তি সটান কাজের কথায় পড়তে চায়। "পায়ের দাগ পাওয়া যায়নি? নাকি—সেদিকে এখনও দৃষ্টি দেওয়ার ফুসরত হয়নি তোমার?"

"দিয়েছি।" জানালেন আদ্যনাথ : "সব প্রথমেই পায়ের দাগে আমার লক্ষ ছিল। সারা বাগানটাই পায়ের দাগে ভরতি। এই যেমন দ্যাখ-না—এই একধরনের পদচিহ্ন। একদম কাঠের পা।"

চাঁচাছোলা ঘাসালো জমির উপরে বিন্যস্ত একজাতীয় বিশেষ দাগের প্রতি কান্তিকুমারের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করলেন।

"এই দাগগুলো দ্যাখ। সহজে কি আমি দাগা পেয়েছি! এমনি কি আমার আক্কেলগুড়ুম হয়েছে?"

কান্তিকুমার দেখল।

"এই লোকটার একটা পা বেমালুম কাঠ। এই কাঠের পায়াওলা লোকটা—" বলতে লাগলেন আদ্যনাথ : "যদ্দূর মনে হয় কোনো জাহাজের খালাসি। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা বলেই মনে হয়—এডেন থেকে এখন আসছে। অল্পদিন হল করাচিতে নেমেছে। করাচি থেকে ট্রেনে এসেছে কলকাতায়। পায়ের দাগ দেখলেই এ সমস্তই স্পষ্ট বোঝা যায়।"

কান্তিকুমার ঘাড় নাড়ল : "ঠিক।"

"আরও বোঝা যায় বোঝাতে লাগলেন আদ্যনাথ : "যে, এই লোকটার ডানহাতে একটা ছড়ি ছিল আর কোমরের ঘুনসিতে বাঁধা ছিল ছোট্ট একটা হুইসিল।"

"তা বেশ দেখতে পাচ্ছি।" কান্তিকুমার ভাবিত মুখে বলল, "এই হুইসিলটা ছিল আবার ডানদিকে বাঁধা। এই কারণে ডানদিকে লোকটার একটু ঝুঁকি পড়েছে তাও দেখা যাচ্ছে।" বোঝাটাকে কান্তি আরও একটু ভারী করে দেয়।

"তোমার কি মনে হয়, কান্তি, যে এই কেঠো-পা খালাসিটাই এডেন থেকে এসে এই খুন করেছে?" আদ্যনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন : "সেই কি করতে পারে তোমার ধারণা?"

"খুব পারে।" কান্তি বলে : "এইসব খালাসিরাই তো এইসব কাণ্ড করে থাকে। খুন করতে পেলে আর কিছু তারা চায় না। জাহাজ থেকে নেমেই তারা খুন করে। লাস আর খালাসির মধ্যে কেমন একটা জড়াজড়ি ভাব রয়েছে দেখছ না?"

বড়দারোগা ঘাড় নাড়লেন : "এবার এই দাগগুলো দ্যাখো, মনে হয় যেন কোনো কাবলিওলার। সুদের তাগাদায় যাতায়াত-করা পা—দেখলেই বোঝা যায়।

খাতকের অপেক্ষায় ওত পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একনিষ্ঠ পা। এখানে-সেখানে নড়েচড়ে দাঁড়ালেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে—এই পায়ের দাগগুলি দেখলে তা-ই কি মনে হয় না? দ্যাখো না, কীরকম মাটির মধ্যে বসে গেছে গভীর হয়ে—''

''হ্যাঁ।'' কান্তি মাথা চালে : ''এ-লোকটাও খুন করতে পারে বটে।''

''এইরকম আরও কত পায়ের দাগ!'' আদ্যনাথ বিবৃতি দেন : ''আরও কত রকমের—কিন্তু সেসব কোনো কাজের নয়। বেশির ভাগ ওইসব অকর্মাদের।'' এই বলে কৌতূহলী জনতার দিকে আদ্যনাথ ভ্রূভঙ্গি করেন : ''বাগানবাড়িটা আমরা এসে ঘেরাও করে ফেলার আগে ওরাই তো জায়গাটা চষছিল কিনা।''

''একটু থামো।'' কান্তিকুমার কী যেন ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করে। ''আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি?''

''আঙুলের ছাপ?'' আদ্যনাথ হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন : ''আঙুলের ছাপের কথা আর বোলো না। সারা বাড়িটাই আঙুলের ছাপে ভরতি।''

''তার মধ্যে বর্মির আঙুলের দাগ হতে পারে এমন কিছু পেয়েছে?'' কান্তিকুমার উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

''বর্মীয় আঙুলের দাগ তিনরকমের পেয়েছি।'' আদ্যনাথের মুখ আরও গম্ভীর হয় : ''কিন্তু সেসব কোনো কাজের নয়!''

কান্তি আবার বিচক্ষণের মতো মাথা দোলায়।

''কিন্তু দারোগা সাহেব'', কান্তি নতুন সমস্যা নিয়ে আসে : ''রহস্যময়ী নারীদের কী খবর? তাদের কাউকে দেখতে পাওনি এখানে এসে?''

''রহস্যময়ী নারী? দেখেছি। সকাল থেকে চারজন গেছে এ-পর্যন্ত।'' আদ্যনাথ বাতলান : ''একজন গেছে সকাল সাড়ে সাতটায়। একজন সোয়া ন-টায়। আর দুজন গেছে বারোটা বাজিয়ে—একসঙ্গে—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটায়।'' আদ্যনাথ বিষণ্ন সুরে অনুযোগ করেন : ''আমার মতে তারা প্রত্যেকেই রহস্যময়। সব মেয়েই আমার কাছে রহস্যময়ী বলে মনে হয়।''

''আচ্ছা, এইবার অন্যদিক থেকে আরম্ভ করা যাক''—কান্তি বলে : ''সমস্ত জিনিসটা নতুন করে গড়বার চেষ্টা করা যাক—নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে। যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে রহস্যের পার পেতে হবে—এই খুনের কিনারায় পৌঁছতে হবে। ভালো কথা, কৃত্তিবাস সেন কি আইবুড়ো ছিলেন—তাই না?''

''আইবুড়োই বটে। বে-থা করেননি, এবং এখন বুড়ো হতে চলেছিলেন। এতবড় বাগানবাড়িতে একলাই থাকতেন তিনি।'' আদ্যনাথ জানান।

''ভালো কথা। তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর এক পেয়ারের খানসামা ছিল। তা না থাকলে তাঁকে দেখত-শুনত কে? এবং সেই প্রিয় ভৃত্যটি নিশ্চয় তাঁর অতিশয় বিশ্বাসী আর পুরাতন—প্রায় বিশ বছর ধরে কাজ করছিল তাঁর কাছে?''

আদ্যনাথ সায় দিলেন মাথা নেড়ে।

''তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বোধহয়?'' কান্তি জিজ্ঞেস করল।

''সবার আগে। চাকরকে আমরা কখনও ছাড়ি না—ছেড়ে কথা বলি না। বিশ্বাসী পুরনো চাকর হলে তো কথাই নেই। এবং তারাও ঠিক তাই প্রত্যাশা করে। বলব কী কান্তি, এই চাকরটা—নাম তার উদ্ভব—আমরা আসা মাত্রই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল! পালাতে পারত, কিন্তু পালায়নি। গ্রেপ্তার হবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল হয়তো।''

"ঠিকই হয়েছে।" কান্তি বলল : "তারপর দেখা যাক। ওই চাকর ছাড়া আর কে কে ছিল বাড়িতে? কোনো ঠাকুমা দিদিমা-স্থানীয়া? কোনো বুড়ি ঝি, দাই-মা গোছের—যে শিশু অবস্থা থেকে কৃত্তিবাসকে মানুষ করে তুলেছে। একেবারে বদ্ধ কালা এরকম কোনো মেয়েছেলে পাওয়া যায়নি বাড়িতে?"

"একেবারে হুবহু।"

"তার মানে?"

"ঠিক ওইরকমের এক বুড়ি ঝি—দাই-মা গোছের—যে কৃত্তিবাসের শৈশব থেকে—"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তা সেই মেয়েটি কি এতবড় এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে কোনো কিছু শুনতে পায়নি? কোন অস্বাভাবিক আওয়াজ? ধ্বস্তাধস্তির শব্দ—বা—?

"টুঁ শব্দটিও না। তবে খুব সম্ভব, এটা তার বদ্ধ কালামির জন্যই বোধহয়।"

চতুর্থ কিস্তি : "ওই মেয়েটিকে আমি বাঁচাব"

"হ্যাঁ, তাও হতে পারে।" কান্তি ঘাড় নাড়লে। "আচ্ছা, ও ছাড়াও এই বাড়ির পেছনে নিশ্চয় আস্তাবল আছে, সেখানে সহিস আর কোচম্যান বাস করে—ঘোড়াদের সঙ্গে। যুদ্ধের বাজারে পেট্রোল দুর্লভ হওয়ায় অনেকেই মোটরের পাট তুলে দিয়ে আজকাল ঘোড়ার গাড়ির চর্চা করছেন—কৃত্তিবাস সেন নিশ্চয় তার অন্যথা ছিলেন না? তা, সেই সহিস কোচম্যানরা কোথায়?"

"কোচম্যান এই খুনের রাত্রে সহিসকে নিয়ে কোনো এক সিনেমায় হোল-নাইট শো দেখতে গেছল—বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে। ফিরেছে আজ সকালে। আমরা এখানে আসার পরে। কান্তি, ওদিকে সন্দেহ করবার কিছুই নেই—ওসব আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি।"

"ওরা কজন ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি কি ব্যক্তিনি কি ছিল না যে এই বাড়ির সঙ্গে বা এই কৃত্তিবাসের সঙ্গে কোনো-না-কোনো প্রকারে বিজড়িত?"

"হ্যাঁ, ছিল। ছিল কেন, আছে। কৃত্তিবাস সেনের লেডি-টাইপিস্ট অলকা দত্ত। কিন্তু সে আসে সকালের দিকে—কর্পোরেশন এবং কৃত্তিবাসের আপিসসংক্রান্ত কাজকর্মের ব্যাপারে, রাত্রির কাণ্ড কিছুই সে জানে না।"

"তুমি কি এই মেয়েটিকে দেখেছ?" কান্তির সাগ্রহ প্রশ্ন : "মেয়েটি দেখতে কেমন?"

"দেখেছি—দেখবার মতো।" জানালেন আদ্যনাথ : "দেখতে মন্দ নয়, সুশ্রীই।"

"এবার এই মেয়েটির পালা। এবার এ বিপদে পড়বে, চাই-কি মারা পড়াও বিচিত্র নয়। একে ঘিরেই হত্যাকারীরা চক্রান্ত করবে এবার—স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি।" দেখতে দেখতে কান্তিকুমার ভাবিত হয়ে পড়ে।

"কী করে বুঝলে?" আদ্যনাথও বিস্মিত হন। "খুন হবার মতো কোনো কারণ মেয়েটির কোথাও নেই।"

"সেইজন্যই তো খুন হবে। কৃত্তিবাসের মধ্যে তেমন কোনো কারণ ছিল নাকি? সত্যি বলতে, এই কৃত্তিবাসই কিছু রামায়ণ লেখেনি—রামায়ণের জন্যে দায়ী নয়। তবু এ খুন হল। কেন হল? এ-মেয়েটিরও তেমনি কোনো দায় না থাকলেও হত্যাকারীরা একে আদায় করতে পারে। কেন ছাড়বে কেন?"

আদ্যনাথ কিছুই বলতে পারেন না। কেবল দাড়ি চুলকান।

"কিন্তু যতই তারা চেষ্টা করুক, তারা ব্যর্থ হবে। বিপর্যস্ত হবে। হবেই। আমিই তাদের বিপর্যস্ত করব। তাদের কুকর্মে বাধা দেব, তাদের চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন করে ফেলব। এই মেয়েটিকে আমি বাঁচাব।"

পঞ্চম কিস্তি : রহস্য আরও নিবিড়

কান্তি এবার দারোগাকে বলল : "আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলো।"

আদ্যনাথ আগে-আগে চলল। অত বড় আর অমন সুসজ্জিত বাড়ির ভেতরে কী অক্ষুণ্ন শান্তি। কোথাও যেন কিচ্ছু ঘটেনি।

"গোলমালের কোনো চিহ্ন দেখছিনে কোনোখানে।" বলল কান্তি।

"না।" জবাব দিলেন আদ্যনাথবাবু : "কোথাও এক চুলের এদিক-ওদিক ঘটেনি : তবে চুলচেরাভাবে দেখলে তা বড় ঘটেও না। যে-লোকটি খুন হয় কেবল সে ছাড়া আর সবকিছুই ঠিকঠাক থাকে। তার নিজের দেহ ছাড়া আর কোথায়ও কোনো বিপর্যয় বড় দেখা যায় না।"

ড্রইংরুমের দ্বার মুক্ত করে ভেতরে গেল তারা। ইলাহি ঘর, আশ্চর্য সব আসবাবে সাজানো। "চেয়ে দ্যাখ, এখানেও অতবড় বিপর্যয়ের কোনো লক্ষণ নেই।" বলেন আদ্যনাথ।

জানালায় জানালায় পরদা নামানো, জামা-পরানো টেবিল-চেয়ার, চাদর-গায়ে-দেয়া পিয়ানো, ত্রিশঙ্কুর মতো ঝোঝুল্যমান বিজলিবাতির ঝালর, সব যে যার যথাস্থানে যথাযথ রয়েছে। কোথাও কোনো ইতরবিশেষ ঘটেনি।

"এসো ওপরে, বিলিয়ার্ডের ঘরে এসো।" আদ্যনাথ বললেন : "লাশ অবশ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে—ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য। কিন্তু আর সবকিছুই ঠিক সেইভাবেই রাখা হয়েছে—এক চুল নড়ানো হয়নি।"

তারা দুজনে দোতলায় গেল। সিঁড়ি পেরিয়েই সামনে সেই বিলিয়ার্ড-ঘর। প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড-টেবল ঘরের মাঝখানটিতে, কিন্তু কান্তি তার প্রতি দৃক্‌পাত না করে সটান জানালার কাছে ছুটে গেল। "হা হা হা!" বলল সে : "এখানে কী? কী দেখছি এখানে?"

দারোগার মাথা নাড়ায় কোনো উত্তেজনা নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত। একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি বললেন : "হ্যাঁ, জানালাটা দেখলে মনে হয় বটে যে বাইরে থেকে খোলা হয়েছে। ধারালো কোনো অস্ত্রের সাহায্যে খড়খড়িটা বার থেকে ফাঁক করা হয়েছে বলে বোধ হয়। জানালার বাইরে কারনিশের জমাট ধুলোয় আন্দোলনের চিহ্নও দেখা যায়। মনে হয় অসাধারণ সাহসী কোনো লোক তলপেটের ওপর ভর দিয়ে খড়খড়ির ফাঁকে হাত গলিয়ে ধারালো কোনো অস্ত্রের সাহায্যে জানালার ছিটকিনিটা—কিন্তু ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই কান্তিবাবু।

বৃথা মাথা ঘামিয়ো না! সব খুনখারাপির ব্যাপারেই ও হয়ে থাকে—প্রত্যেক কেসেই দেখা যায়।"

"সেকথা সত্যি।" কান্তি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এবার সে ঘরের মধ্যে ইতস্তত তাকাতে লাগল। এবং তার কণ্ঠ থেকে স্বতস্ফূর্ত বিস্ময়ের আবেগে উচ্চধ্বনি উছলে উঠল। "ওই কুলিঙ্গিটা দেখেছ? পরদার প্রায় আড়ালে প্রকাণ্ড ওই তাকটা? তাকিয়ে দ্যাখ।"

"বহু আগেই দেখেছি।" আদ্যনাথ জানালেন : "কুলিঙ্গির জমানো ধুলোর মধ্যেও দুশ্চিহ্ন দেখা গেছে। ধুলোর স্তর ইতস্তত করা—বেশ নড়ানোচড়ানো। পায়ের দাগের ছাপও অস্পষ্ট দেখা যায়। অসাধারণ ক্ষিপ্র কোনো লোকের পক্ষে ওই তাকের ওপরে লাফিয়ে উঠে পরদার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিচ্ছু অসম্ভব নয়।"

"ছাদের কাছটা দেখেছ?" কান্তি এবার নজর উঁচু করে। "ছাদের কাছের ওই ঘুলঘুলিটা? একটু অস্বাভাবিক আকারের নয় কি? কী মনে হয় তোমার? ওখানেও কি একজন—?"

"স্বচ্ছন্দে। কড়িকাঠে দড়ি লাগিয়ে দেওয়ালের গা বেয়ে উঠে একজন লোক অনায়াসে ওই ঘুলঘুলির ফাঁকে শুয়ে থাকতে পারে। অসাধারণ ধূর্ত কোনো লোক সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বসবাসের জন্যে ওইরকম জায়গাই বরং পছন্দ করবে!"

"এক মিনিট। থামো একটু।" কান্তির আবার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে : "ওই ভ্যানিটিব্যাগের অর্থ কী? ওখানে ঝুলছে—ওই যে?"

আধুনিক কোনো মহিলার অতিআধুনিকতার চূড়ান্ত উদাহরণস্বরূপ চমৎকার একটি ভ্যানিটিব্যাগ দেওয়ালের গা-লাগা একটা আলনার আঁকশিতে ঝুলছিল।

"হ্যাঁ, ওটার কথাও যে ভাবা হয়নি তা নয়।" বললেন আদ্যনাথ : "ওতে আমরা হাত দিইনি—ওটাকে ওখানেই রেখে দিয়েছি। কেমন যেন আমাদের মনে হয়েছে ওইখানেই এই রহস্যের কিনারা আছে। বিশেষ একটা মতলবেই ওটা অমনি রেখে দেওয়া হয়েছে। যে ওই ব্যাগটি নিতে আসবে, সে যে এই খুনের সঙ্গে কোনো-না-কোনোরূপে জড়িত তাতে আর কিছু ভুল নেই। আমাদের ধারণা—"

কিন্তু কান্তি আর উক্ত ধারণায় কর্ণপাত করছিল না। সে তখন বিলিয়ার্ড-টেবলের ধার-ঘেঁষে গেছে।

"দ্যাখো দ্যাখো।" চিৎকার করে উঠছে সে : "এইবার বুঝি রহস্যের একটা কিনারা পাওয়া গেল। বিলিয়ার্ড-বলগুলোর পজিশন দ্যাখ। শাদা বলটা টেবিলের ঠিক মধ্যিখানে আর লাল বলটা টেবিলের শেষে পকেটের একেবারে ধারে ধারে। এর মানে কী, আদ্যনাথ, মানে কী এর?"

আদ্যনাথ দারোগাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কান্তি—আদ্যোপান্ত ধরেছে। তার চোখে উদ্বেগ—কণ্ঠে ব্যাকুলতা ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে আদ্যনাথকে চুরমার করতে চায় যেন সে।

"আমার জানা নেই।" আদ্যনাথ জানালেন : "বিলিয়ার্ডে খেলা আমি জানিনে।" এই আকস্মিক জড়াজড়িতে তাঁকে যেন একটু বিরক্তই দেখা গেল।

"আমিও জানিনে।" কান্তি বলল : "কিন্তু আমাকে জানতে হবে এর রহস্য। এক্ষুনিই। এর উপরেই এই হত্যাকাণ্ডের আসল ফয়সলা নির্ভর করছে। কাছাকাছি বইয়ের দোকান নেই কোনো? কিংবা কোনো লাইব্রেরি—ইংরেজি বইয়ের? একটা বিলিয়ার্ডের বই জোড়াড় করা দরকার।"

এই বলে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কান্তি উধাও হয়ে গেল।

দারোগা আদ্যনাথ স্তব্ধ হয়ে—চিন্তাপ্লুত হয়ে—দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত রোগা বলে তাঁর মনে হতে লাগল।

"চলে গেল!" অস্ফুট স্বগোক্তি বেরুল তাঁর গলা থেকে—(তাঁর নিজের চিন্তাধারা ও মতামত নিজেকে বিড়বিড় করে জানানোর এই বিড়ম্বনা তাঁর বহুকালের—তাঁর এই বদভ্যাস থেকে মনে হয় দেওয়ালের কান থাকায় তাঁর বিশ্বাস নেই)।

"আশ্চর্য! থরহরিবাবু কেন ওর উপরে নজর রাখবার জন্য আমাকে টেলিফোনে জানালেন—? কান্তির গতিবিধির উপর লক্ষ রাখার জন্য প্রত্যহ তিনি পঞ্চাশ টাকা করে দেবেন তাও বলেছেন। কিন্তু কেন যে!—?"

ষষ্ঠ কিস্তি : "ও বিলিয়ার্ডের খড়ি নয়"

ইতিমধ্যে বিশ্ববার্তা কার্যালয়ে থরহরিবাবুর বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। কাজ সেরে তিনি হুক থেকে কোট পেড়ে নিয়ে "নিজের গায়ে চাপাচ্ছেন। এমন সময়ে একজন কর্মচারী, বোধহয় মনিবকে খুশি করার মতলবেই অযাচিতভাবে এগিয়ে এল।

"আজ্ঞে, আপনার কোটের হাতায় সবুজমতো কী দেখা যাচ্ছে। কিসের যেন দাগ। বিলিয়ার্ডের খড়ির দাগ বলেই বোধ হচ্ছে যেন। মুছে দেব কি?"

থরহরি ঘুরে দাঁড়ালেন। কর্মচারীটির আপাদমস্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করলেন একবার। তারপর বললেন : "এ বিলিয়ার্ডের খড়ি নয়। ফেস পাউডার। বুঝেছ?"

এই বলে সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, এককথায় বিলিয়ার্ডের চকের মতো সেই লোকটিকেও যেন মুছে দিয়ে, শান্ত গম্ভীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

সপ্তম কিস্তি : করোনারের তদন্ত

খুনের পরদিন করোনারের তদন্ত শুরু হল। কিন্তু তার ফলে পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক, নতুন নানান জট পাকিয়ে পেকে উঠে রহস্য যেন আরও জটিল হয়ে উঠল। ডাক্তারি পরীক্ষার দ্বারা বিশেষ কিছুই জানা গেল না—নির্বিশেষে অনেক কিছু জানা গেল। উক্ত ডাক্তারের মতে মৃতের দেহে আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কণ্ঠনালির উপর চাপ পড়ায় নিশ্বাসবায়ুর পথরোধে মৃত্যু ঘটেছে এমন সিদ্ধান্তও করা যায়, আবার আলজিভ আটকে গিয়ে মৃত্যু ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়। গলগ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি দেখা যায়। এদিকে মস্তিষ্কের স্নায়বিক শিরাও বিচ্ছিন্ন। এইসব নানাবিধ লক্ষণ বা দুর্লক্ষণের মধ্যে ঠিক কোনটি নিশ্চিতরূপে মৃত্যুর কারণ বলা কঠিন।

তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা গেছে বটে। মৃতের পাকস্থলীতে আধসের টাক আফিমগোলা পাওয়া গেছে তরল পানীয়ের আকারে। এই সম্পর্কে করোনার কোর্টের সরকারি উকিল এবং উক্ত ডাক্তারের জিজ্ঞাসাবাদ বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

"পাকস্থলীর মধ্যে আফিমগোলা ওই পরিণামে পাওয়া কি একটু অস্বাভাবিক নয়?" তিনি প্রশ্ন করেছেন : "বিশেষ করে একজন কাউন্সিলারের পাকস্থলীতে? আপনার কী মত?"

"একটু অস্বাভাবিকই বইকি।" উত্তর হয়েছে ডাক্তারের, "তবে সেটা সাধারণ পাকস্থলীর পক্ষেই প্রযোজ্য। একজন কাউন্সিলারের পেটে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।"

"আধসের আফিমগোলা একটু বেশি পরিমাণের বলে কি আপনার মনে হয় না?"

"তা ঠিক বলা যায় না।"

"তবে কি ওটা পরিমাণে কম আপনি বলতে চান?"

"না, তাও বলতে চাই না।"

"আধসের আফিম গোলা গলাধঃকরণের ফলে মৃত্যু কি একান্তই অনিবার্য?"

"কোনো কাউন্সিলারের বেলায় তা নাও হতে পারে। হতেই যে হবে তার কোনো মানে নেই।"

"তবে কি একজন কাউন্সিলারের পেটে আধমণ আফিমগোলা পেলেই আপনি আশ্চর্য হতেন? এবং সেটা মৃত্যুর কারণ বলে মনে হত?"

"মোটেই না। কাউন্সিলারদের হজমশক্তি সাধারণতই অসাধারণ।"

ডাক্তারি তদন্ত এইখানেই শেষ।

তার পরে কৃত্তিবাসের চাকর উদ্ভবের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। তার কাছ থেকে অনেক রহস্য বের হয়েছে—কিন্তু তা রহস্যের উপর রহস্য। ম্যাগনেলিয়ার উপরে মালাই বরফ—পরস্পরে মিলে সমস্যাটা আরও জমজমাট হয়ে গেছে যোগফলে। উদ্ভব দিব্যি গেলে বলেছে দুর্ঘটনার দিনে সে নিজে হাতে আধসের আফিম মিছরির পানায় গুলে বিকেলের জলখাবারের সঙ্গে বাবুকে দিয়েছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও জানিয়েছে, এটা তার বাবুর নিত্যকর্মের মধ্যে—প্রত্যহের বৈকালিক জলযোগ। সরকারি উকিলের জেরায় সে বলেছে যে আফিমটা আধসের নয়, আধভরি ছিল মাত্র, মিছরির পানাটাই ছিল আধসের। তবে দুটোয় মিলে আধসের আধভরি ওজন হওয়া যে অসম্ভব নয় এটা সে সম্ভব মনে করে। এই ভৃত্যটি, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের মতো সর্বগুণান্বিত না হলেও, বিশ বছর ধরে কৃত্তিবাসের তদ্বির-তদারক করছে সেকথাও জানা গেল।

ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানকেও পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করা হল। প্রায় তিন বছর থেকে কৃত্তিবাস সেনের এখানে কাজ নিয়েছে—যুদ্ধের দরুন পেট্রোল দুর্লভ হয়ে বাবুর মোটড়গাড়ি অচল হওয়ার পর থেকেই সে আছে বলা যায়।

"একথা কি সত্য যে দুর্ঘটনার দিনে কর্তার সঙ্গে তোমার ভয়ঙ্কর কলহ হয়েছিল?" করোনারের উকিল জিজ্ঞেস করেছেন।

"হ্যাঁ সত্য, কর্তা সিনেমা দেখার ছুটি দিচ্ছিলেন না বলেই।"

"কর্তাকে তুমি খুন করবার ভয় দেখিয়েছিলে? সত্য কি?"

"না। সেকথা বলিনি।"

"কিন্তু লোকে যে শুনেছে তুমি খুন করব খুন করব বলে চ্যাঁচাচ্ছিলে?"

"কথায় কথায় আমার মাথায় এমন খুন চেপে গেছল যে আমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে, হুজুর, আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান—এই কথাই আমি বলেছিলাম।" বলল কোচম্যান।

অষ্টম কিস্তি : করোনারের কর নাড়া

"তখন খুন চাপেনি, এখন খুনটা চাপছ—তা-ই নয় কি?"

"না হুজুর।" বলেছে কোচম্যান।

করোনার তাঁর নথিপত্রের প্রতি তাকালেন। "অলকা দত্তকে ডাকা হোক।" তাঁর হুকুম হল। অলকা দত্তের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা আদালতে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। অলকা ধীর পদক্ষেপে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দিয়ে দাঁড়াল।

ছিপছিপে লতানো চেহারা অলকার। তার ফরসা মুখে অদ্ভুত এক দীপ্তি। প্রত্যেক অকাণ্ড কুকাণ্ডের সঙ্গে—সমস্ত বিপর্যয়ের মূলেই কোনো-না-কোনো মেয়ে জড়ানো থাকে। আদালতের মধ্যে ডিটেকটিভ বইয়ের পাঠক যারা ছিল তাদের কাছে তা অজানা ছিল না। এই চমৎকার মেয়েটি কি এই বিদঘুটে ব্যাপারের সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত নাকি? সেইসব পাঠকদের মনে এই প্রশ্নটাই বড্ডা ধাক্কা মারছিল।

মেয়েটি কিন্তু সত্যিই কাঁপছিল। সে যে খুব বিপন্ন বোধ করছে তার মুখচোখ দেখলেই তা মালুম হয়। কিন্তু তা হলেও পরিষ্কার করে, আস্তে আস্তে, মিষ্টি সুরে সে তার বক্তব্য বলে গেল। তার সাক্ষ্যের কোনোখানেও একটু হোঁচট খেল না।

প্রশ্ন হল, "কৃত্তিবাস সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?"

অলকা। "আমি তাঁর লেডি-টাইপিস্ট ছিলাম।"

প্রশ্ন। "কতদিন ধরে এ-কাজ করছেন আপনি?"

উত্তর। "প্রায় বছর তিনেক।"

প্রশ্ন। "কখন আপনি কাজে যেতেন এবং ফিরতেনই-বা কোন সময়ে?"

উত্তর। "আমি সকালের দিকেই যেতাম কেবল। বেলা দশটার মধ্যে আমার যা কাজ সব সেরে আমি বেরিয়ে পড়তাম।"

প্রশ্ন। "সেখান থেকে বেরিয়ে আপনি যেতেন কোথায়?"

উত্তর। "চৌরঙ্গির এক রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়েটেয়ে বাড়ি ফিরতাম তারপর।"

প্রশ্ন। "রোজই কি আপনি ওই রেস্তোরাঁয় দুপুরে খেয়ে থাকেন।"

উত্তর।"হ্যাঁ, রোজ। এখনও।"

প্রশ্ন। রেস্তোরাঁটার নামটা কি আমরা জানতে পারি?"

করোনার সরকারি উকিলের এই প্রশ্ন বাতিল করে দিলেন—এ-কথার উত্থাপন তিনি অনুমোদন করলেন না। জুরিদের একজন জিজ্ঞেস করল, "শর্টহ্যান্ডও কি আপনার জানা আছে?"

"হ্যাঁ, পিটম্যানের।"

জুরিদের আরেক জনের প্রশ্ন, "আপনি কি সিনেমায় যানটান।"

এই প্রশ্নের জবাবে অলকা জানিয়েছে : "হ্যাঁ মাঝেসাঝে, কেউ নিয়ে গেলেই।"

অলকার এই উত্তর আদালতের মনে খুব ভালো দাগ কেটেছে। তার সম্বন্ধে সজুরি করোনারের ধারণা একটু উচ্চতর হয়েছে যেন। এই একটি কথায় সেখানকার সর্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করল অলকা।

কিন্তু সরকারি উকিল তথাপি প্রশ্ন তুললেন : "কুমারী অলকা দত্ত, একটি কথা

কি আমরা জানতে পারি? খুনের পরে বিলিয়ার্ড-ঘরে যে-ভ্যানিটিব্যাগ ঝুলতে দেখা গেছে সেটি কি—সেটি কি আপনার?"

করোনার হাঁ হাঁ করে পড়লেন—"না না। এ-প্রশ্ন আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না—" হাত নেড়ে তিনি বাধা দিলেন : "একথা কেন? এসব অবান্তর কথা কেন? এ-প্রশ্ন থাক। মিস দত্ত, আপনাকে আর কোনো কথার জবাব দিতে হবে না। আপনি এখন কাঠগড়া থেকে নামতে পারেন।"

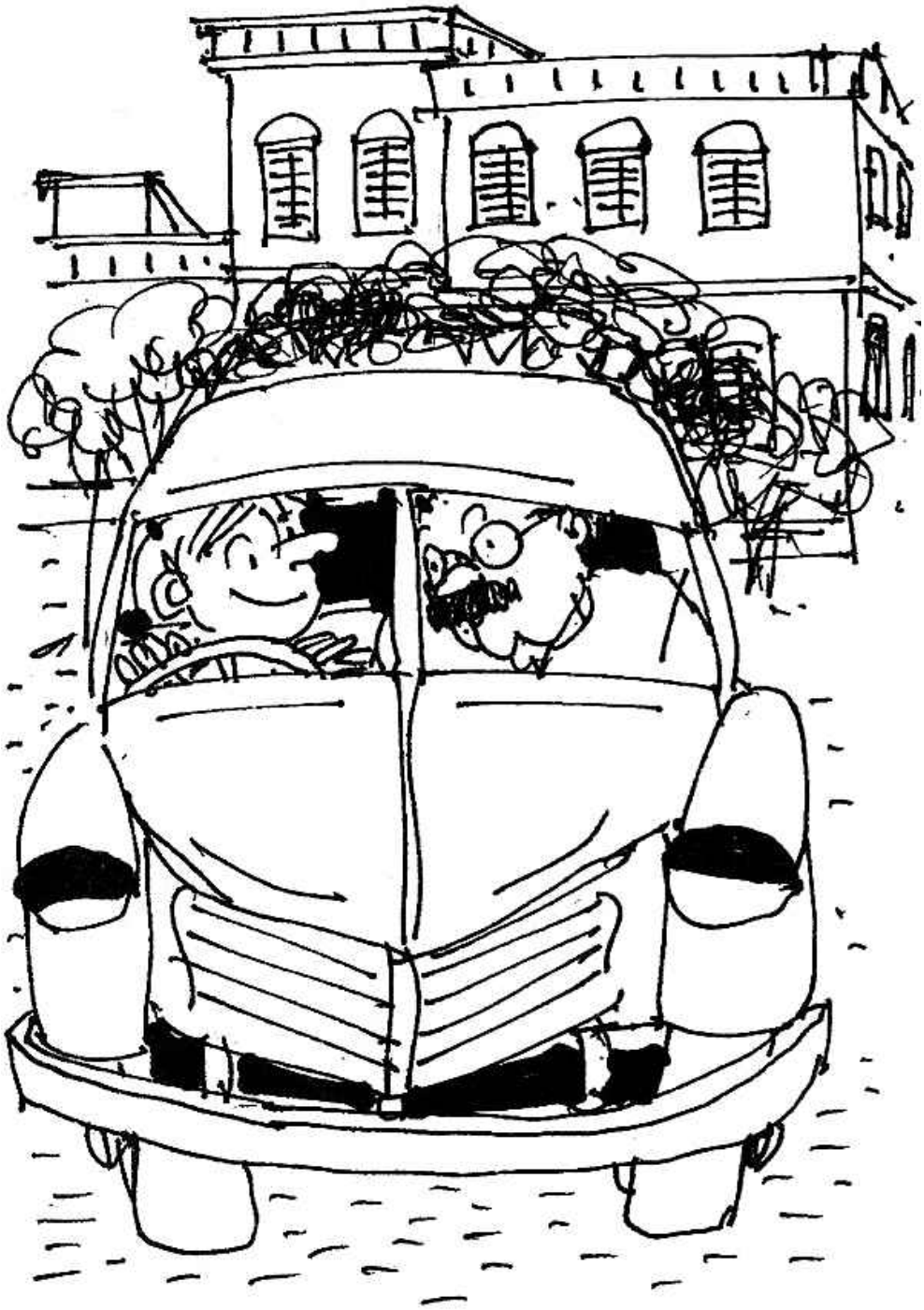

নবম কিস্তি : কালুকে কি কেউ দেখেছ?

কিন্তু সবচেয়ে বেশি সোরগোল পড়ল থরহরিবাবুর বেলায়। বিশ্ববার্তার পরিচালক থরহরিবাবু তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন কৃত্তিবাসের সঙ্গে খুনের দিন সন্ধ্যায় একত্রে এক সাহেবি হোটেলে তিনি খানা খেয়েছেন। এমনকি তাঁকে নিজের মোটরে করে কাশীপুরের বাড়িতেও তিনি পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

"আপনি সেদিন সন্ধ্যা ঠিক কটার সময় কৃত্তিবাসবাবুর বাড়িতে গেছলেন?" জিজ্ঞেস করলেন সরকারি উকিল : "এবং কতক্ষণ ছিলেন তাঁর সঙ্গে?"

"এ-প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।" বললেন থরহরিবাবু। "কিছুতেই না।"

"কেন, এর দ্বারা কি আপনার এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা আছে?" জিজ্ঞেস করলেন করোনার—থরহরিবাবুকে।

"তা হতে পারে।" বললেন থরহরি।

"তা হলে এর উত্তর দেয়া না-দেয়া আপনার খুশি। আপনি স্বচ্ছন্দে নিরুত্তর থাকতে পারেন। আইনত সে-অধিকার আপনার আছে।"

থরহরিকে এই কথা বলে করোনার সরকারি উকিলের দিকে ফিরলেন : "তা হলে ওঁকে আর ওই প্রশ্ন করবেন না। উনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। অন্যকিছু জিজ্ঞেস করুন।"

"আচ্ছা বেশ।" সরকারি উকিল থরহরির দিকে আবার ফিরলেন : "তারপর ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার পরে আপনারা দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত বিলিয়ার্ড খেলেছিলেন—একথা কি সত্যি?"

"থামুন থামুন!" করোনারের কাছ থেকে বাধা এল আবার : "করছেন কী! এ প্রশ্ন আমি কিছুতেই করতে দিতে পারি না। একেবারে সোজাসুজি—নিতান্ত খোলাখুলি এ কি অভদ্র প্রশ্ন! এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য তেমন সাধু নয়—এর মধ্যে বিচ্ছিরি কোন ব্যাপারের যেন ইঙ্গিত রয়েছে মনে হয়। আপনি অন্য কোন প্রশ্ন করুন।"

"বেশ, তা-ই।" ঘাড় নাড়লেন সরকারি উকিল। "আচ্ছা বলুন তো থরহরিবাবু, নীল রঙের এই খামখানা এর আগে আপনি কখনও দেখেছেন কি না?"

"আমার জীবনে না।" থরহরি জানালেন।

"অবশ্যই উনি দেখেননি।" বললেন করোনার : "এ-বিষয়ে দ্বিরুক্তি করার কী আছে? ওঁর মতো মান্য ব্যক্তি কি অকারণে নিঃস্বার্থভাবে মিথ্যা বলবেন ! দিন তো দেখি খামটা, কী আছে ওতে?"

"আজ্ঞে, এই খামখানা নিহত কৃত্তিবাসের জামায় আলপিন দিয়ে আঁটা ছিল, হুজুর।

"তা-ই নাকি ?" বললেন করোনার : "কী আছে ওই খামে?"

আদালতসুদ্ধ রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার মধ্যে সরকারি উকিল নীল খামের ভেতর থেকে সবুজ রঙের একখানা কাগজ বার করলেন। সবুজ কাগজখানায় আবার স্ট্যাম্প লাগানো। সবুজ পত্রের লেখাটা তিনি পড়তে লাগলেন :

"আমি কাশীপুর কলকাতা নিবাসী শ্রীকৃত্তিবাস সেন বহাল তবিয়তে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার এই সর্বশেষে উইল করিতেছে। এতদ্বারা আমার স্থাবর

অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখলস্বত্ব আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীমান কালু সেনকে দিয়া গেলাম।"

সারা আদালত এই উইল শুনে একবার যেন খাবি খেল। কারও মুখে একটি কথা নেই। কেবল করোনার চারিদিকে ঘুরে ফিরে তাকালেন একবার।

"কালু সেন কি এখানে উপস্থিত আছেন?" হাঁক দিলেন করোনার।

কোনও উত্তর এল না।

"এখানকার কেউ কি এই কালু সেনকে দেখেছেন?" আবার করোনারের গলা শোনা গেল।

তবুও কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার সেই একই প্রশ্ন তথাপি কাউকে নড়তেচড়তে দেখা গেল না।

"হুজুর, এই কালু সেনকে পাওয়া গেলেই এই মৃত্যুর রহস্যের হয়তো কোন কিনারা হতে পারে।" শেষ কথা বললেন সরকারি উকিল। "হলেও হতে পারে।"

দশ মিনিট ধরে গবেষণা করে জুরি এবং জজ একমত হয়ে তাঁদের রায়ে এটাকে খুন বলেই সাব্যস্ত করলেন। কে বা কাহারা অগোচরে এসে কাশীপুরের কৃত্তিবাস সেনকে খুন করে গেছে এই কথা তাঁদের রায় থেকে জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই কাণ্ডকে কিছুতেই আত্মহত্যা বলে গণ্য করা যায় না। জনৈক জুরি তাঁর স্বতন্ত্র রায়ে জানালেন, এই খুন যে শ্রীমান কালুর কীর্তি, সে ছাড়া আর কারও না, সে-বিষয়ে তিনি দশ টাকা বাজি ধরতেও রাজি আছেন।

করোনার উদ্ভব চাকরকে বেকসুর খালাস দিয়ে উক্ত কালুর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করার হুকুম দিলেন।

দশম কিস্তি : কান্তি কিন্তু ক্লান্তি জানে না

হতভাগ্য কাউন্সিলারের ধ্বংসাবশেষ মর্গ থেকে উদ্ধার করে স্বর্গের পথে রওনা করে দেয়া হল। যতদূর সম্ভ্রম এবং সমারোহের সঙ্গে কাউন্সিলার-তুল্য একজনের সদ্গতি করা উচিত তার কোনোই ব্যত্যয় করা হল না। তাঁর শবযাত্রাকে শোভাযাত্রায় পরিণত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল—তবু কেবল কয়েকটা রাস্তার চ্যাংড়া ছাড়া নিমতলা ঘাট অবধি শেষ পর্যন্ত কেউ গড়াল না। প্রত্যেক রাস্তাতেই এই চ্যাংড়ারা স্বাভাবিক কৌতূহলবশে কিংবা হরিবোল দেবার প্রলোভনে স্বর্গীয় কাউন্সিলারের পিছু নিয়েছিল, কিন্তু নিজেদের রাস্তার সীমান পর্যন্ত এগিয়েই ফের পিছিয়ে এসেছে। যা-ইহোক, রিলে-রেসের মতন বদলে বদলে গেলেও, কোন না কোনরূপে এই চ্যাংড়ারাই, কাউন্সিলারটির শূন্যস্থান পূর্ণ করার কোন স্বার্থ বা সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও এই অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতির মহিমা এবং মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছে দেখা গেল।

কলিকাতা-মহানগরী আবার তার সুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। কৃত্তিবাস সেন এবং তাঁর মৃত্যুরহস্য আস্তে আস্তে ভুলতে বসল সবাই।

ভুলল না কেবল কান্তি। আহার নেই নিদ্রা নেই টো টো করে ঘুরছে। রোদ নেই বৃষ্টি নেই (এবং সেইজন্যেই মাথায় ছাতা নেই) ঘুরছে সে। এই এখানে, ওই সেখানে—সর্বত্র সে। কোথায় নেইকো? কালু সেনের সন্ধানেই ঘুরছে কান্তি। যেখানেই কয়েকজন জড় হয়ে গুলতানি করছে কান্তি হাজির, আর কিছু না, কালু সেনের খোঁজে। হাওড়া শেয়ালদহের মতো জায়গায়, হাজার হাজার লোক সর্বদাই যেখানে ওতপ্রোত হচ্ছে—অনুক্ষণ কত যাত্রীর যাতায়াত—কান্তি মিত্র সেখানে

www.Murchona.com

ক্লান্তিহীন। এই সে এধারে, আবার সে ওধারে—প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর গভীর এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত বুলিয়ে নিতে ব্যস্ত। একজন স্টেশনের কর্মচারী একবার তো ওর ঘাড়খানাই ধরল—"কী হচ্ছে। কী হচ্ছে এসব? লোকের মুখের দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন?" কান্তি বললে : "একজন দাগি আসামির আমি সন্ধানে আছি। আমি ডিটেকটিভ।" "মাপ করবেন, আমি জানতাম না। কিছু মনে করবেন না।" বলে কাঁপতে কাঁপতে সাত হাত পিছিয়ে গেছে সেই কর্মচারী। গোয়েন্দা আর সাপ কাকে কখন ছোবল মারবে কেউ বলতে পারে? শত হস্তেন গোয়েন্দানাং—একজন গোয়েন্দাও আরেকজনের একশো হাত তফাতে থাকে।

সারাদিন ধরে এধারে ওধারে নানাধারে কান্তি ইতস্তত করছে। তার কামাই নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা সে চায়ের দোকানে বসে—একটা পর একটা দোকানে—এবং যত চা-পায়ী যাচ্ছে আসছে তাদের ওপর নজর দিতে তৎপর। এমনকি, তিন দিন সে ছুতোরের ছদ্মবেশ ধরে কী-এক ছুতোয় থরহরিবাবুর বাড়ির দ্বারদেশেও কাটিয়েছে—যদি সেখান থেকে কালুর কোন সন্ধান মেলে।

কিন্তু তথাপি এই কালুর কোন হদিশ নেই। যতদূর জানা আছে শ্রীমান তিন বছর আগে অবধি তার কাকা কৃত্তিবাসের আলয়ে থাকত—তারপর হঠাৎ সে একদিন কেন বলা যায় না, সেখান থেকে উধাও হল। এই পাত্তাড়ি গুটোবার পর থেকে আর তার কোন পাত্তা নেই। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, বিশ্ববার্তার বিখ্যাত সম্পাদকীয় ভাষায় তখন এই মন্তব্য করা হয়। ধরণি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হাঁ করে তাকে গিলে ফেলল নাকি?—এ-প্রশ্নও তখন করা হয়েছিল।

এগারোর কিস্তি : "এই নাগরাওয়ালাকে এক্ষুনি পাকড়াও"

তিন বছর আগে, বিশ্ববার্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যা-ই হোক-না কেন, কান্তি কিন্তু হার মানার পাত্র নয়। উক্ত হাঁ-করা ধরণি কে হতে পারে তা নিয়ে সে অবিশ্যি একটু মাথা ঘামিয়েছিল। যেই হোক, কৃত্তিবাস সেনের কর্পোরেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরণি সেন নয় এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হবার এক সপ্তাহ বাদেই সে আদ্যনাথের কাছে গিয়ে হাজির হল।

"দারোগাবাবু, বলল গিয়ে কান্তি : "আমার আরও কতকগুলি বিষয় জানার দরকার। আমাকে আর একবার কৃত্তিবাস সেনের কুটিরে নিয়ে চলো তো!"

দুজনে আবার বরানগর কাশীপুরের সেই বিরাট অট্টালিকায় প্রবেশ করল। বিলিয়ার্ড-ঘরে পা দেবার সময়ে কান্তি বলল : "প্রথমবারে হয়তো এখানকার কিছু কিছু আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। আদৌ তা অসম্ভব নয়।"

"তা তো হয়ই। নজর এড়িয়ে যায়ই তো!" কান্তিকুমারের অভিযোগে আদ্যনাথবাবু সায় দিয়েছেন।

"আচ্ছা এখন বলো তো, "কান্তি আরম্ভ করে—(তারা তখন সেই বিলিয়ার্ড-টেবলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে)— "এই খুনের ব্যাপারে তোমার নিজের ধারণাটা কী? তোমার, মানে পুলিশের ধারণার কথাই আমি বলছি। ধারণাগুলি একে একে বাতলাও তো—সবগুলিই আমার জানা দরকার।"

"আমাদের প্রথম ধারণা কী ছিল তা তো তোমার অজানা নয় কান্তি। এই হত্যাকাণ্ড এডেন থেকে সদ্যআগত কোনো এক-পাওয়ালা (আরেক পায়া কাঠের) দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর দ্বারা ঘটেছে—এই ছিল আমাদের সব-প্রথম ধারণা।"

"বেশ উচ্চ ধারণা। এমন কিছু অসঙ্গত নয়।" সায় দিল কান্তি।

"আমাদের ধারণায় এই লোকটা হচ্ছে কোনো মালবাহী জাহাজের খালাসি।"—একঘেয়ে সুরে একটানা পূর্ববৃত্তান্ত দিতে শুরু করল আদ্যনাথ। "এই লোকটা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যে ত্রিশ ফুট উঁচু এই বাড়ির গা বেয়ে উঠে—একজন রাজমিস্ত্রিও সারাদিনে যার সাত ফুটের বেশি উঠতে পারে না—উঠে এই বিলিয়ার্ড-ঘরের জানালার বাইরে পৌঁছে অসাধারণ কৌশলের দ্বারা বাহির থেকে খড়খড়ির খিল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। লোকটা যে অসাধারণ ধূর্ত তাও বেশ বোঝা গেছল নিহত কৃত্তিবাসের গলায় প্যাঁচানো রুমালের উদ্ভূত পাক দেখে। ওরকম কড়াপাক কেবল ভবানীপুরের সন্দেশের দোকানে আর এডেনের ধাড়ি ধাড়ি বদমাইশের রুমালেই দেখতে পাওয়া যায়, এবং এও জানা গেছল যে লোকটার একটা পা একদম কাঠের..." বলতে বলতে আদ্যনাথ দারোগা থামলেন। তাঁকে যেন একটু চিন্তাকুল দেখা গেল।"একটা পা একদম কাঠের—এইরকমই আমাদের ধারণা হয়েছিল প্রথম। কিন্তু কেন যে এরূপ ধারণা হল তা এখন আমি বলতে পারব না। একদম মনে পড়ছে না।"

"দূর দূর! কী যে বল তুমি আদ্যনাথ! এই ধারণা হবার কারণ এই যে বিলিয়ার্ড-টেবলের এধারের মেহগনির ওপরে লোকটার হাতের চাপ পড়েছিল—এবং চাপটা বেশ একটু বেশিরকমই পড়েছিল—যেটা সাধারণ মানুষের চাপ হিসাবে ঠিক স্বাভাবিক নয়। তা-ই থেকেই বোঝা গেল যে লোকটার উপরার্ধের ভার নিম্নার্ধের চেয়ে গুরুতর—তা-ই নয় কি? তা-ই থেকেই লোকটার কাঠের পা সম্বন্ধে ধারণা জন্মাল—পায়ের দিকটা তার মাথার দিকের চেয়ে হালকা বলেই না?—এই কাঠের ধারণা তার সম্বন্ধে এমন কিছু কঠোর ধারণা নয়। কিন্তু এই প্রথমকার ধারণা এখন আমরা বর্জন করেছি। তা-ই নয় কি?"

"নিশ্চয়ই। প্রথমকার ধারণা আমরা প্রথমেই বর্জন করে থাকি। আমাদের চিরকালের দস্তুর। আমাদের দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে—"

কিন্তু কান্তির কান আর সেদিকে ছিল না। মেঝের ওপর কী যেন সে তীব্র নেত্রে নিরীক্ষণ করছিল।

"হাঃ হাঃ! এ কী দেখছি মেজেয়?"—আনন্দ কি দুঃখ কিসের আবেগে বলা যায় না। পুনঃপুনঃ কান্তির অট্টহাসি শোনা গেল "এর অর্থ কী? হাঃ হাঃ হাঃ।"

মেঝের একটি অমার্জিত জায়গায় আদ্যনাথের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল।

"এ তো আমরা দেখিনি!" বললেন আদ্যনাথ। "আগে তো দেখিনি।"

"পায়ের দাগ।...পায়ের নয়, জুতোর।" বলতে বলতে কান্তি পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

"একজোড়া জুতোর ছাপ—একটাও তার কাঠের নয়। নাগরা জুতো বলেই মনে হচ্ছে—লক্ষ্ণৌয়ি নাগ্রা। তবে আগ্রার হওয়াও আশ্চর্য না। জুতোর তলায় বড় বড় কাঁটি মারা—কিংবা ঘোড়ার পায়ে যেমন নাল লাগানো হয় তাও হতে পারে। লোকটা পাঁচ ফুট—সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা—"

"একটু সবুর করো, কান্তি!" আদ্যনাথ বাধা দিয়ে বলেন : "তুমি যে কী বলছ আমি ঠাওর করতে পারছি না। লোকটা যে ঠিক অতটাই লম্বা তা কী করে তুমি জানলে?"

"পায়ের পাতার পরিধি থেকে পা কতখানি উঁচু তা ধরতে পারছি। আর পায়ের দৈর্ঘ্য পেলে লোকটার আসল উচ্চতা টের পেতে আর অসুবিধা কী? আদ্যনাথ, এই নাগরাওলা লোকটাকে এক্ষুনি পাকড়াও। ওকে পেলেই এই খুনের রহস্য ভেদ হবে।"

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই সিঁড়ি দিয়ে নাগরা জুতোর খটাখট শোনা গেল। বিলিয়ার্ড-ঘরের দরজা খুলে সেই নাগরাওয়ালা প্রবেশ করল তারপর।

কান্তি এবং আদ্যনাথ দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলেন। এমনকি, সেই ঘরে চোখের সামনে তখন নাগ্রাপ্রপাত দেখলেও বোধহয় ততখানি বিচলিত হতেন না।

লোকটা ঠিক পাঁচ ফুট সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা। পায়ে তার নাগ্রা (লক্ষ্ণৌ বা আগ্রা যেখানকারই হোক)। লোকটার পরনে কোচম্যানের পোশাক! আদবকায়দা কেতাদুরস্ত।

পরলোকগত কৃত্তিবাসের ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান, দেখবামাত্র বুঝতে কান্তি বা আদ্যনাথের কোন বেগ পেতে হল না।

"আপনিই কি কান্তিবাবু?" জিজ্ঞেস করল সেই কোচম্যান, "একটি ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।"

বারোর কিস্তি : "কান্তিবাবু, আপনি বাঁচান আমায়।"

পরমুহূর্তে সিঁড়িতে প্রায় নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনা গেল। লম্বা এবং চমৎকার একটি তরুণী অতি আধুনিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন।

কুমারী অলকা দত্ত।

অলকার সাজসজ্জায় আধুনিকতার অত্যন্ত উগ্রতা থাকলেও তার হাতে যে ভ্যানিটিব্যাগ ছিল না তা কান্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি।

"কান্তিবাবু", অলকা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল : "আপনিই কান্তিবাবু, তা-ই না? এরা বলছিল যে আপনি এখানে এসেছেন কান্তিবাবু, আপনি বাঁচান আমায়।"

অলকার দেহ থরথর কাঁপছিল। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার।

"শান্ত হও কুমারী অলকা দত্ত।" সান্ত্বনার ছলে বলল কান্তি। "বিচলিত হয়ো না। এত ঘনঘন তোমার নিশ্বাস খরচ কোরো না। এমন হাঁসফাঁস করবার কী আছে? আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে নির্ঘাত বাঁবাব।"

"আমারও তা-ই বিশ্বাস।" নিশ্বাসের দ্রুতগতি অনেকটা কমিয়ে এনে বলল অলকা।

"কী বলবার আছে আমায় বলো তুমি।" বলল কান্তি।

"কান্তিবাবু,—" নিজেকে সামলাতে পারলেও তখনও অলকার গলা কাঁপছিল, "আমার ভ্যানিটিব্যাগটা আমি চাই।"

"বসো। দিচ্ছি এনে।" এই বলে, কান্তি আলনার আঁকশি থেকে ব্যাগটা পেড়ে এনে অলকার হাতে তুলে দিল।

"আঃ, এটা ফিরে পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে কী বলব!" ব্যাগটাকে আদর করে নিজের গালে একবার বুলিয়ে নিল অলকা। "আপনাকে যে কী ভাষায় ধন্যবাদ জানাব জানিনে। এটা নিতে আসতে আমার যা ভয় করছিল।"

"না না, ভয়ের কোন কারণ নেই।" আদ্যনাথবাবু জানালেন : "পুলিশের ধারণায় এই ব্যাগটা হচ্ছে এই বাড়ির বুড়ি ঝির। আপনি স্বচ্ছন্দে এটা নিতে পারেন।"

কান্তি কিন্তু মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল—"আমরা মনে হয় এই খুনের ব্যাপারের অনেক কিছুই তুমি জান। সত্যি কি না? তা হলে আমাকে বলো সে-সমস্ত।"

"বলব। আমি বলব কান্তিবাবু! ওঃ, কী ভয়ঙ্কর সেই রাত—ভাবলে এখনও আমার বুক কাঁপে। এখানেই ছিলাম আমি তখন। সব দেখেছিলাম—না দেখলেও—নিজের কানে শুনেছি সব।"

অলকা বারংবার কেঁপে উঠল।

"ওঃ কান্তিবাবু, এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। সেদিন সন্ধ্যায় আমি এখানে এসেছিলাম। হাতের অনেক কাজ বাকি পড়ে ছিল, সেগুলো সারতে এসেছিলাম। কৃত্তিবাসবাবুর সেদিন সন্ধ্যায় কোথায় যেন নেমন্তন্ন ছিল শুনেছিলাম, কাজেই নিরিবিলি আপিসঘরে বসে আমার কাজ সারতে কোন বাধা হবে না, ভেবেছিলাম। যখন এলাম, কেউ ছিল না তখন। এই বিলিয়ার্ড-ঘর পেরিয়েই তো গেলাম—এখানের আলনায় আমার ভ্যানিটিব্যাগ রেখে ওপাশের আপিসঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছি—কতক্ষণ একমনে কাজ করেছি তা মনে নেই—হঠাৎ এই বিলিয়ার্ড-ঘরের থেকে চ্যাঁচামেচি আমার কানে গেল। চ্যাঁচামেটি ক্রমশ ঝগড়া হয়ে দাঁড়াল—দুজনের দারুণ কলহ—শুনলাম। সমস্তই নিজের কানেই শুনতে হল। শোনা খুব অন্যায় হয়েছে কি, কান্তিবাবু?"

"কিছুমাত্র না।" বলল কান্তি : "চোখের পাতা বোজা যায়—অবাঞ্ছনীয় দৃশ্য আমরা ইচ্ছা করলে নাও দেখতে পারি। কিন্তু কানের পাতা বোজবার যে কোন উপায়ই বিধাতা রাখেননি, অলকা দেবী।"

"আপনার কথা শুনে আমার শরৎবাবুর উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সে-কথা থাক, কান্তিবাবু। তারপর কী শুনলাম, শুনুন। একজন বলছিল, 'এ্যায়্, কী হচ্ছে? তুমি টেবিলের ওপর অতটা ঝুঁকি দিচ্ছ কেন?' আরেকজন বলল, 'আমার খুশি।" তখন প্রথমজন বলল, 'টেবিলের ওপর থেকে তোমার ভুঁড়ি সরিয়ে নাও। হটাও তোমার ভুঁড়ি।' দ্বিতীয়জন বলল—'হটাব না। আমার ভুঁড়ি আমার—তোমার কী?' তখন সেই ১ নম্বর লোকটা বলল—ভয়ঙ্কর গর্জে উঠল এবার—'তোমার ভুঁড়ি তোমার? বটে? এক্ষুনি সরিয়ে নাও বলছি, নইলে এই পিস্তলের গুলিতে, দেখছ তো, ওই ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।' তারপর একটুক্ষণ চুপচাপ। তার একটু বাদেই আর্তনাদ শুনতে পেলাম—'ফাঁসিয়েছ, ফাঁসিয়েছ! সত্যিই তুমি আমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে?' তখন অপর ব্যক্তিটি, নরম গলায় একটু অনুতপ্ত সুরেই বলল যেন, 'আমায় ক্ষমা করো। আমি ফাঁসাব বলে ফাঁসাইনি। আমার গুলি যে তোমার ওই গণ্ডারের চামড়া ভেদ করতে পারবে এ-বিশ্বাস আমার ছিল না।'"

অলকা একটু দম নিল। কান্তি ও আদ্যনাথ বলল : "তারপর? তারপর কী হল?"

"তারপর আমার এমন ভয় হল আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে একছুটে নিজের বাড়িতে চলে এলাম—পরদিনের খবরের কাগজে সে-রাত্রির সমস্ত ঘটনা জানা গেল। আমার ব্যাগটা বিলিয়ার্ড-ঘরে পড়ে আছে তাও জানতে পারলাম। তার পর থেকে যে কী ভয়ে রয়েছি—কান্তিবাবু, আপনি আমাকে বাঁচান।"

"অবশ্যিই বাঁচাব, তুমি ভয় খেয়ো না, অলকা দেবী। নির্দোষকে কেবল মারা নয়, মাঝে মাঝে বাঁচানোও, আমাদের গোয়েন্দার ধর্ম বইকি! তুমি ঠাণ্ডা হও। এখন একটা কথা আমায় বলো দেখি! যে-লোকটা কৃত্তিবাস সেনের বিপক্ষে খেলছিল—তাকে কি তুমি দেখেছিলে?"

"একবার মাত্র, চকিতের জন্যই।" বলতে একটু ইতস্তত করল অলকা :

"দরজা একটুখানি ফাঁক করে—সেই ফাঁকে একটু ঈষৎ দেখেছিলাম।...খুব অন্যায় করেছি, মাপ করবেন।"

"কিরকম দেখতে লোকটা?" জিজ্ঞেস করল কান্তি : "মুখ দেখলে কি মনে হয় তার মনের মধ্যে প্রবেশ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার? খুব দুর্ভেদ্য—অনেকটা এইরকম মুখ কি?" কান্তি মিত্র কায়ক্লেশে নিজের মুখে অলকার সম্মুখে দৃষ্টান্তটা দেখাবার চেষ্টা করে।

"অবিকল।"

"প্রকাণ্ড লম্বাচওড়া একটা মুখ—মনে হয় সমস্ত দেহে কেবল শুধু ওই মুখখানাই আছে?"

"তা-ই মনে হয় বটে।"

"অলকা দেবী," কান্তি জানাল : "এই খুনের রহস্য আমি প্রায় ভেদ করে এনেছি। যখন বাকিটুকুরও কিনারা করতে পারব তখন সমস্ত গল্পটা আগগোড়া এসে বলব তোমায়। তুমি শুনবে তো?"

কান্তি ভরাট দৃষ্টি দিয়ে তাকাল অলকার মুখে।

"শুনব বইকি! আপনি বলবেন, আমি শুনব না?" জবাব দিল অলকা। "আপনার কথা শুনব না—কী বলেন!"

এবং এই কথা বলে কুমারী অলকা দত্ত নিজের ব্যাগহাতে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দ আওয়াজে নিচে নেমে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কান্তি টেলিফোন হাতে করেছে : "হ্যালো, এটা কি বিশ্ববার্তা আপিস? এ্যাঁ?.....বিশ্ববার্তা?...বড়কর্তার ঘরে দাও। ও—আপনি?...বড়কর্তা?...আমি—আমি কান্তি। কাশীপুরের রহস্য আমি সমাধান করেছি।..."

বলেই কান্তি মুহূর্তখানেক কান-খাড়া করে রইল—প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু থরহরিবাবুর কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য পাওয়া গেল না। অবিচলিত সুরে তাঁর জবাব এল :"কালু সেন কি ধরা পড়েছে?"

"থরহরিবাবু, কেবল কালু সেন নয়, এই মৃত্যুরহস্যের আগাগোড়া আমি ধরেছি। ধরতে পেরেছি।—" কান্তি বলল, তার বলার কায়দায় আর প্রত্যেকটি কথায় বিশেষত্ব দিয়ে—বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়ে বলল কান্তি—"কার মৃত্যু তা সকলেই আমরা জানি। খুড়ো কৃত্তিবাস মরেছেন, এইটুকুই জেনেছি কেবল। এবং এও জানা গেছে যে কৃত্তিবাসের ভাইপোই তাঁকে মেরেছে। কিন্তু কেন মেরেছে, কীভাবে মেরেছে এবং সেই ভাইপোই-বা কোথায় এখন অবধি তার কিছুই আমরা জানতাম না। মৃত্যু-কাহিনীর এই পরিচ্ছেদগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পরিচ্ছেদগুলোকেই আমি পাকড়েছি, এই কথা বলতে চাই আপনাকে।"

"বটে? বেশ তো!" অচঞ্চল স্বরে বললেন থরহরি। "বেশ।"

"এবং এই কাহিনীটিই আগাগোড়া, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ আপনাকে আমি শোনাতে চাই।"

"কিন্তু এই টেলিফোন-কানে শোনা তা কি সম্ভব হবে? যদি হয় তো শোনাও। দুমিনিটের মধ্যে সারতে পারলে আমার আপত্তি নেই।"

কিন্তু দুমিনিটে রামায়ণ গান, স্বয়ং রামচন্দ্র কান পাতলেও, বোধহয় শোনানো যায় না। কান্তি খানিক ইতস্তত করে, স্বভাবতই। কিন্তু বেশিক্ষণ সে ইতস্তত করে না।

"গল্পটা টেলিফোনে না বলে বিলিয়ার্ডের টেবিলে বললে বোধহয় ভালো শোনাবে। সচিত্র করে বলা যাবে হয়তো।"

"তার মানে?" থরহরি প্রশ্ন করলেন।

"তার মানে, আপনি বিশ্ববার্তা থেকে সোজা আপনার বাড়িতে আসুন। আমিও যাচ্ছি। সেখানে আমাদের দুজনের বিলিয়ার্ড খেলার ভেতর দিয়ে আমার বক্তব্যটা ব্যক্ত করব। এই ব্যাপারটার এমন কতকগুলি বিশেষ দিক আছে যা বিলিয়ার্ডের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না দেখলে ধরা পড়বে না। যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে পঞ্চাশ পয়েন্টের খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে আমি প্রস্তুত—তার মধ্যেই খেলা এবং গল্প দু-ই আমার শেষ হবে। বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না।"

থরহরি বললেন : "বেশ।"

"শেষ হল তো ভালোই, নইলে তোমাকেও আমি শেষ করব।"—সেইসঙ্গে এই কথাও তিনি মনে-মনে বললেন কি না কে জানে! থরহরির দুর্গম মনস্তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করা যে-কোনো কল্পনা-কুশল লেখকের পক্ষেও অসাধ্য।

থরহরিকে বিলিয়ার্ডে চ্যালেঞ্জ করা একটা যা-তা নয়। তাঁর মতো ধীর মস্তিষ্ক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খেলোয়াড় কলকাতায় খুব কমই আছে। তাঁকে বিলিয়ার্ডে হারাতে কদাচ কেউ পেরেছে। একচোটে নয়, দশ, এমনকি বারো পর্যন্ত বলের কে কোথায় রয়েছে তাঁর শ্যেনদৃষ্টির কাছে এড়াবার জো ছিল না—এবং তাদের কোনটাকে কীভাবে পিটতে হবে স্বভাবতই তিনি বুঝতে পারতেন।

তবে কান্তিও প্রতিপক্ষ হিসাবে কিছু-কম ছিল না। আনাড়ির মার বলে একটা কিছু আছে—কান্তির ছিল সেই সুবিধা। কান্তি একদম আনাড়ি। বিলিয়ার্ডের বিষয়ে অল্পদিনের পুঁথিগত বিদ্যা তার। তবে সাংবাদিকরা পারে না কী? হয়কে নয় করতে তাদের তুল্য কে আছে? সংবাদপত্রের রিপোর্টারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কাজেই, এর আগে কখনও না খেললেও কান্তি কোনো অংশে কম যায় না।

কান্তির অদ্ভুত বিলিয়ার্ডি চাল! কুশনের আড়ালে নিজের বল রেখে, প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে এবং তার নিজের মারের বেলায় সেই বল হয় সবেগে নয় একলাফে ধারের পকেটে গিয়ে স্থানলাভ করেছে।

স্কোর খুব চটপট বেড়ে উঠল—দুজনেই প্রায় সমান-সমান। আধ ঘণ্টা খেলার শেষে এরও দশ ওরও দশ। থরহরি তাঁর ভারী মুখ আরও ভার করে উঠেপড়ে লেগেছেন—টেবিলের ওপরে তাঁর এক পা। কান্তি, উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমায় উঠেও অতীব শান্ত, বলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। বল আর তার চোখের মধ্যে এক ইঞ্চির ফারাক।

পনেরোর সময়েও তারা সমান। থরহরি হঠাৎ একচোটে তিন পয়েন্ট মেরে বসেছেন, কিন্তু এ-চোটও সামলে নিয়েছে কান্তি। আরও মিনিট কুড়ি খেলার পর দুজনে উনিশে এসে আবার সমকক্ষ হয়েছে।

কিন্তু কান্তিকুমার মিত্রের মনে খেলায় জেতা ছাড়াও অন্য আরও কিছু বুঝি ছিল। এইবার সেটা পরিষ্কার হয়ে পড়ল। তার সুযোগ এল এতক্ষণে। দক্ষ হাতের এক মারে, খুব ওস্তাদও কদাচ যা পারে, কান্তি থরহরির বলকে বেশ একহাত দেখে নিল। লাল বলটা পকেটের হাঁ-এর মুখে গিয়ে দাঁড়াল। শাদা বলটা টেবলের ঠিক মাঝখানে।

কান্তি থরহরির মুখের দিকে তাকিয়ে।

বলগুলি ঠিক সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—কৃত্তিবাসের মৃত্যু-তিথিতে তার বাড়ির টেবিলে ঠিক যেমনটি করে দাঁড়িয়েছিল।

"আমি ইচ্ছা করেই ওরকমটা করেছি।" বলল কান্তি। সহজ সুরেই বলল।

"তার মানে?" জিজ্ঞেস করলেন থরহরি।

বলের ওইরূপ অবস্থা দেখেও তিনি যে কিছু দুর্বল হয়েছেন তা মনে হল না।

"তার মানে, ওই বলের মধ্যেই রয়েছে।" কান্তি জানাল। "থরহরিবাবু আসুন, এবার একটু বসা যাক। আপনাকে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। অবিশ্যি যা বলব তা আপনার অজানা নয়। আপনি বুদ্ধিমান, ইতিমধ্যেই তা আঁচ করতে পেরেছেন।"

কান্তির কথাতেও বেশ আঁচ। তার ভেতরে যে-আগুন জ্বলছিল তারই আঁচ বোধহয়। কান্তি আজ অগ্নিকাণ্ড না করে ছাড়বে না। যে-থরহরি, সারা বিশ্বময় বিশ্ববার্তাকে থরহরি-কম্পিত করে রাখেন, সামনে দাঁড়িয়ে এখনও সে অকম্পিত।

দুজনে মুখোমুখি দুটো কুশন অধিকার করে বসল। থরহরি শান্তভাবে একটা সিগ্রেট ধরালেন। মনে হল তাঁর হাত যেন একটু কাঁপল—সিগ্রেট ধরানোর সময়ে। চকিতের জন্যই মনে হল কান্তির।

"বেশ।" সিগ্রেট-মুখে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কী বলতে চাও বলো?"

"থরহরিবাবু,—" কান্তির কান্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হয়—"দু-সপ্তাহ আগে আপনি আমাকে এক জটিল রহস্য সমাধানের ভার দিয়েছিলেন। তার কিনারা আমি করেছি। আজ রাত্রে—এই মুহূর্তে—এখনই সেই সমাধান আপনাকে জানাতে পারি। আপনি কি জানতে চান?"

থরহরির কপালে কি কপোলে একটিও রেখা পড়ল না।

"বেশ তো!" বললেন তিনি। "জানাই যাক-না!"

"একটা মানুষের জীবন বিলিয়ার্ড খেলায় শেষ করে দেয়া যায়—স্বচ্ছন্দেই যায়—তা-ই না, থরহরিবাবু?" কান্তি বলে : "আপনার কাছে অপরের জীবনের দাম বিলিয়ার্ডের চেয়ে বেশি নয়—তা-ই নাকি?"

"তার মানে? তুমি বলতে চাও কী?" এইবার থরহরির হুঙ্কার শোনা গেল : "তুমি কী বলতে চাও শুনি?"

"তার মানে তুমি—তুমিই খুন করেছ কৃত্তিবাসকে।" কান্তি বলল দৃঢ়স্বরে। থরহরির সামনে দাঁড়িয়ে কোথথেকে যে, কেবল স্বরে নয়, ব্যঞ্জনাতেও তার দৃঢ়তা এল কে জানে! এবং নিজের অমিত্বের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে থরহরির সঙ্গে আপনা-আপনিত্বও যেন সে ভুলে গেল। স্রেফ তুমিত্বে তাকে পর্যবসিত করতে একটুও তার দ্বিধা হল না।

"তুমিই—বিশ্ববার্তা পরিচালক শ্রীযুক্তবাবু থরহরি দত্ত—দোর্দণ্ডপ্রতাপশীল, চক্রান্তকারী এবং বদমায়েশ—এতদিনে তোমার স্বরূপ এবং চালচলন প্রকাশ পেয়েছে। তুমি ধরা পড়েছ।"

থরহরির বিপক্ষে তার মনে তার নিজের অগোচরে এতদিন ধরে তার এত রাগ এবং এত বেশি বিরাগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা কান্তি নিজেই জানত না—কিন্তু কেন যে হয়েছিল তা না জানলেও—এবার তা প্রকাশের সরল এবং সঙ্গত পথ পেয়ে তার সমস্ত উষ্মা যেন লভাপ্রবাহের মতো টগবগ করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। থরহরিকে ধরে থোড়ের মতো কুচিকুচি করে কাটতে পারার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে তা সে জানত না। হাতিকে কাত দেখতে পেলে হস্তাদলিতদের যে অপার্থিব আনন্দ দেখা যায় এ বুঝি সে-আনন্দ।

"কুচক্রী, ভণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতক—বাবু থরহরি দত্ত ওরফে—তোমার আসল নাম বলতে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই আর—ওরফে কালু সেন—তুমিই হচ্ছ কৃত্তিবাস সেনের হত্যাকারী।"

তবু, তথাপিও থরহরির কপালের একটি শিরাও কাঁপল না। একটিও কথা না বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কান্তিও উঠে দাঁড়াল সেইসঙ্গে। একটিও কথা না বলে

থরহরি কান্তির গালে সাজোরে এক চপেটাঘাত করলেন। সেই থাপ্পড়টাই যেন তাঁর একটি মাত্র কথা। যারপর-নাই কথা।

"তার মানে?" কান্তি গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

"তার মানে, শ্রীমান কান্তিকুমার মিত্র, তুমি একটা মিথ্যুক।" এই বলে থরহরি আবার নিজের কুশনে বসে পড়লেন।

কান্তিও বসল—নিজের কুশনটা একটু সরিয়ে নিয়ে এবার। থরহরির চড়টা তখনও গালে জ্বলছিল।

"কেবল মিথ্যুক নও ; তুমি আস্ত একটা ধাপ্পাবাজ। কিন্তু কোথায় এসে চালাকি করছিলে তা টের পাওনি। পিরের কাছে মামদোবাজি চলে না। তুমি যে আসলে কে, তা গোড়া থেকেই আমার জানা ছিল—তোমার এই গোয়েন্দাগিরির প্রহসন শুরু হবার সময় থেকেই। তুমি জান না, কিন্তু জেনে রাখো যে তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের ওপর লক্ষ রাখা হয়েছিল, কোথায় তুমি যাও, কী কর না-কর—তোমার সমস্ত চালচলনের ওপরে পুলিশের কড়া নজর ছিল। কান্তিকুমার মিত্র আসলে যে কালু সেন ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমাদের অজানা ছিল না। তিন বছর আগে কালু সেন কৃত্তিবাস সেনের গৃহত্যাগ করেছে, আর অজ্ঞাতকুলশীল কান্তি মিত্রেরও ঠিক তিন বছর আগেই সাংবাদিকরূপে অভ্যুদয়। অতএব কান্তি মিত্র ওরফে কালু সেন, আমার বন্ধু নিহত কৃত্তিবাস সেনের হত্যার জন্য তোমাকেই আমি দায়ী করি। তবে তোমাকে পুলিশের হাতে দেয়া না-দেয়া আমার ইচ্ছাধীন। আমার নিজের হাতেই তোমাকে আমি শেষ করতে পারি।" একটানা এত বড় একটা বক্তৃতার পর—তাঁর জীবনে এত অধিক বাক্যব্যয়ের বাহুল্যতা এই প্রথম—থরহরি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের হাতে কান্তি মিত্র ওরফে কালু সেনকে আরেকবার শেষ করার বাসনা প্রবল হলেও তেমন কোনো উদ্যম দেখা যায় না।

এবার কান্তি মিত্র কুশন ছেড়ে উঠে এসে তাঁর নাকে এক ঘুসি লাগায়।

"মিথ্যাবাদী!" চেঁচিয়ে ওঠে কান্তি : "আমি কালু সেন নই। কক্ষণও না।"

ঠিক এই মুহূর্তে থরহরির জনৈক ভৃত্য দরজা ফাঁক করে প্রবেশ করে।

"একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, কর্তা।" সে জানায়।

"কে!" থরহরি জিজ্ঞেস করেন। নাকের শুশ্রূষা থামিয়ে।

"আমি চিনি না, তবে তাঁর এই কার্ড দিয়েছেন।"

থরহরি দত্ত কার্ডটি হতে নিলেন। কার্ডের ওপরে স্পষ্টাক্ষর মুদ্রিত : —কালু সেন।

কার্ডদৃষ্টে থরহরি এবং কান্তি দুজনে দুজনের দিকে তাকাল—দুটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো। কস্ত্বং? তা হলে— তা হলে কে তুমি—এই যেন প্রশ্ন।

একটু আগে যেখানে তত্ত্বমসির লড়াই চলেছে, তুমিই সেই—পেস ছাড়া আর কেউ না—এহেন উচ্চ দার্শনিকতা দেখা গেছে, কার্ডের পৃষ্ঠে দেগে দেয়া 'কালু সেন' এই দুটি কথায় তা যেন আলোর উদয়ে মসির তত্ত্বের মতো তুচ্ছ হয়ে গেল। সোহং-এর আবির্ভাবে তছনছ হয়ে গেল সব।

"লোকটাকে উপরে নিয়ে এসো।" বললেন থরহরি।

মিনিট দুই পরে লোকটা এল। কান্তির শ্যেন চক্ষু কালু সেনকে বিক্ষত করতে লাগল। তার সবুজরঙা পোশাক, রোদ-চটা তামাটে মুখ আর লম্বা লম্বা আঙুল দেখলে লোকটা কী কাজ করে সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। জাহাজের খালাসি বলে সহজেই চেনা যায়।

"বসো।" বললেন থরহরি।

"ধন্যবাদ।" বলল সেই খালাসি : "বসতে পারলে বাঁচি। আরকিছু না, আমার কাঠের পা-টা একটু স্বস্তি পায় তা হলে।"

থরহরি আর কান্তি আবার পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করল। লোকটার পা কাঠের দেখে বিস্ময়ে কান্তি কাঠ হয়ে গেল, আরও দেখল, যা-তা কাঠ নয়, চন্দন কাঠ। লোকটা (দয়া করে বা চটে গিয়ে) কারও গায়ে যদি পা ঘষে দেয় তা হলে সে-পদাহত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গন্ধে ভুরভুর করবে। এটা কেবল কাঠের সত্য নয়, কঠোর সত্য।

"আমি এডেন থেকে আসছি।" উপবিষ্ট হয়ে কালু জানাল।

ঘাড় নাড়ল কান্তি। "এখন দেখতে পাচ্ছি—" বলল সে : "থরহরি—থরহরিবাবু, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল। মূলত যে এটা এডেনাগত কাঠের এক-পা-ওয়ালা একজন লোকের কাজ আগেই তা আমাদের ঠাওর হওয়া উচিত ছিল। সে ছাড়া আর কারও কীর্তি নয়। এ ছাড়া অন্য কাউকে ঠাওর করতে যাওয়াই আমাদের অন্যায় হয়েছিল।"

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী—" কাঠের পা-টাকে আরামে রেখে নড়েচড়ে বসে কালু আরম্ভ করে :

"আমি আমার জবাবদিহি দিতে এসেছি। আমার স্বীকারোক্তি শুনুন। যদিও সাধারণত পুলিশের শিকার হবার পরই এই উক্তি করাটা দস্তুর—কিন্তু তার আর সময় নেই। আমি নিজেই আমার শিকার—দুর্ভাগ্যের শিকার। যতদূর মনে হয়, আমার আর বেশি সময় নেই। এখানকার—ঠিক ইহলোকের কি না জানি না—তবে এখানকার খাঁচা থেকে এখনই আমাকে উড়তে হবে।...যতক্ষণ সময় আছে আমার শেষ কথাটা শেষ করে নিই।"

"সেকী!" কান্তি সবিস্মিত হয়ে ওঠে : "তুমি কি অন্তিমক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছ? শেষ মুহূর্তে এসে দেখা দিয়েছ আমাদের?"

"তা-ই কি স্বাভাবিক নয়? সেইটাই ঘটে না কি সচরাচর?" পালটা প্রশ্ন এল কালুর দিক থেকে। "আপনারাই বলুন।"

"হ্যাঁ, তা-ই ঘটে থাকে বটে।" কান্তি ঘাড় নাড়ল : "তা হলে নিশ্চয়, তোমার বক্তব্যের মাঝে মাঝে গলার ঘড়ঘড়ানি উঠে তোমাকে বাধা দেবে বোধ হচ্ছে? হয়তো বেদম কাশিও আসতে পারে—তা-ই না?"

"আপনি সর্বজ্ঞ। আপনাকে নমস্কার!" কালু সেন পা তুলবার চেষ্টা করল, পারল না। অগত্য কেবল হাত তুলেই নমস্কার জানাল। "ঠিকই ধরেছেন আপনি।...তবে গলার ঘড়ঘড়ানিটা আমি উপসংহারের জন্যে রেখেছি। বেদম কাশিটা মাঝে মাঝে আমদানি করব বটে, তবে তার দেরি আছে।"

"গাল বেয়ে রক্তও গড়িতে পড়তে পারে? এঁ্যা?" থরহরির আশঙ্কা হয়—তকতকে মেঝের দিকে তাকিয়ে।

"আজ্ঞে না, অতদূর গড়াবে না।" জবাব দিল কালু : "এবার তা হলে আত্মজীবনী শুরু করা যাক। বাল্যকালের থেকেই আরম্ভ করি—কেমন?"

"না না, দোহাই, তা কোরো না।" কান্তি এবং থরহরি সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। এমনকি এতদিনের ও এত কাণ্ডের অকম্পিত থরহরিকে থরথর কাঁপতে দেখা যায়।

কালু সেন ভ্রূকুঞ্চিত করে। "আমার ধারণা, আমার আত্মজীবনী শোনাবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে।" সে বলে। "যে-লোকটা একজন লোকের প্রাণ নিয়েছে এবং অপর একজনের—মানে, নিজের—প্রাণ দিতে চলেছে—প্রাণের আদানপ্রদান যার কাছে এমন অকাতর এবং তুচ্ছ—তার যা খুশি সবাইকে শুনিয়ে

দেবার অধিকার আছে বইকি। এটা বার্থ-রাইট না হতে পারে, কিন্তু ডেথ-রাইট যে তাতে সন্দেহ কী? অতএব আমার কাহিনী আপনাদের শুনতে হবে। শুনতেই হবে—না শুনে উপায় নেই।"

তেরোর কিস্তি : কালুর কালোয়াতি

"ছোটবেলা থেকেই আমার দুর্দান্ত স্বভাব।" কালু বলতে থাকে : "যখনই যা মনে হয়েছে তা-ই করেছি। তখন-তখনই যদি কেউ আমাকে শাসন করত—আমার স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করত তা হলে বোধহয়—"

"কিন্তু তা করা হয়নি।" থরহরি বাধা দেন : "তারপর?"

"আমার কাকার তিন কুলে একা আমিই ছিলাম। আর কাকার ছিল অগাধ ঐশ্বর্য। অপর্যাপ্ত বিলাসের মধ্যে ছোটবেলা থেকে বর্ধিত হয়ে, কোনোদিন যে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বা তার প্রয়োজন হবে, তা বোধ করিনি।—"

"ভালো কথা," কান্তি সবকিছুই চুলচেরা খতিয়ে দেখার পক্ষপাতী, বাধা দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে : "তখন তোমার কটা পা? পায়ের সংখ্যা কত ছিল?"

"দুই। মাত্র দুই। ভগবদ্দত্ত সবার যেমন থাকে। কিন্তু অল্পদিনেই বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্তে উঠতে গিয়ে—"

"তোমার পা ফসকাল। মানে একটা পা।" থরহরির পাদটীকা : "কালুভায়া, চটপট তোমার আসল কথায় এসে পড়ো। আমার খিদে পেয়েছে।"

"এই এলাম।" বলল কালু : "দেরি নেই। কিন্তু মহাশয়রা যতদূর মনে করেছেন ততটা না। খারাপ আমি ছিলাম বটে, কিন্তু একেবারে খারাপ ছিলাম না।"

"না না। তা তো নয়ই।" থরহরি এবং কান্তি সান্ত্বনার ছলে সায় দিল : "তা কে বলেছে? পরের টাকা এবং দুশ্চরিত্র সকলেই বেশি বেশি দেখে কিন্তু তা হলেও শতকরা নিরানব্বই জনের চেয়ে বেশি খারাপ কক্ষণই তুমি ছিলে না।"

"এমনকি আমার জীবনেও ভালোবাসা দেখা গিয়েছিল। যেমন প্রত্যেকের জীবনেই দেখা দেয়। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে ভালোবাসা এলেও ঠিক তেমনটি আসে কি না সন্দেহ আছে। তেমনটি আমি কখনও দেখিনি। এডেনেও না, এমনকি বসোরাতেও নয়। তাকে দেখলে মনে হয় যেন মূর্তিমতি করুণা। সেই কাশীর মহিষী করুণার মতো। সে যেমন গরিবদের কুটিরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ইনিও তেমনি এই গরিবের মনে—বেশি আর কী বলব? যেন রবীন্দ্রনাথের সেই 'আনন্দময়ী মুরতি তোমার কোনো দেব তুমি আনিলে দিবা?' তিন বছর আগে সেই করুণা আমার কাকার বাড়িতে এল—"

"জানি, জানি। টাইপিস্টরূপে।...তারপর?" কান্তি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

"তারপর আমি—আমি তাকে না ভালোবেসে পারলুম না। প্রথমে বোনের মতো—তারপর বন্ধুর মতো—তারপর—"

"তারপর যৎপরোনাস্তি—ঠিক যেমন হয়ে থাকে। তার পরে, তার পরের মোদ্দা কথাটা আমরা শুনতে চাই।" থরহরি বললেন। "যদি বলতে চাও তো বলো।"

"তার পরে একদিন তাকে নিয়ে আমি সিনেমায় গেলাম। আমার কাকা, কী করে জানি না, সেটা টের পেলেন। সিনেমার ওপরে তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। সিন আর সিনেমা তাঁর ধারণায় ছিল এক জিনিস, এমনকি সহিস কোচম্যানদেরও তিনি সিনেমা দেখার ছুটি দিতেন না—পাছে তারা ঘোড়াদের বখিয়ে দেয়।"

"ঘোড়ার কথা থাক," কান্তি বলল : "তোমার কথা বলো। কাকা ওই কাণ্ড টের পাবার পর কী হল তা-ই শুনি?"

"ভারি তিনি চটে গেলেন। এমনকি ওই নিয়ে আমাদের মধ্যে ভীষণ কলহ পর্যন্ত হয়ে গেল। শেষে তিনি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিলেন।—"

"ত্যাজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র। তা-ই না কি?" কান্তি ভ্রমসংশোধন করে।

"ত্যাজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র করে তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করে ঘাড় ধরে তাঁর বাড়ি থেকে আমাকে তিনি বার করে দিলেন। তাড়িয়ে দিলেন আমায়।"

কালু থামল, এইবার সেই পূর্বপ্রতিশ্রুত কাশির ধমকটা দেখা দেবে বলে কান্তি মিত্রের মনে হয়। থরহরি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। বোধহয় এই তাঁর জীবনের প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস। নিজের জন্য যা কখনোই তাঁকে ফেলতে হয়নি, কোনো কারণ ঘটেনি ফেলবার, অন্যের গৃহ-বিতাড়িত হবার দুঃখে অনেক দিনের জমানো সেই দীর্ঘনিশ্বাস এই সুযোগে তিনি পরিত্যাগ করেন।

কালু সেনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরম্ভ করে আবার।

"ছোটবেলায় আমার আরেক ভালোবাসা ছিল। শিশুর থেকে আমি সমুদ্রকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম।"

"কোনো শিশুর থেকে?" কান্তির সাগ্রহ প্রশ্ন।

"সমুদ্রের প্রতি টান আমার ছোটবেলার। নৌকো দেখলে তার পালের আগে-আগে আমি ছুটতাম।"

"নৌকোর পাল?" কান্তি আরও অবাক হয় এবার। "তোমার সামুদ্রিক পরিভাষা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নৌকোর পাল আবার কী? নৌকোরাও কি গোরুর মতন পালে পালে চরে নাকি? আর চরলেও, তাদের আগে-আগে না ছুটে পিছনে পিছনে দৌড়ানোর বাধা ছিল কী?"

কালু সেন কান্তির কোনো জবাব দিতে পারে না। কাশতে আরম্ভ করে। জবাব দিতে পারে না বলেই কাশিবাস শুরু করে বোধহয়।

চোদ্দর কিস্তি : কার্য এবং কারণ বনাম কারণ এবং কার্য

কাশির অনর্গলতা কমলে কালু জানায় : "সব পালাটা শুনুন আগে আমার। তারপর বলবেন। কাকা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে আমার সেই বাল্যকালের ভালোবাসা মনে পড়ল। সমুদ্রকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম। শিশু- পাঠ্য বই পড়ে যে-ভালোবাসা জন্মেছিল, সিনেমায় সমুদ্রের ছবি দেখে জমে জমে তা বেড়ে উঠেছিল অনেকখানি। একটা জাহাজে খালাসির কাজ নিয়ে যেদিকে দু- চোখ যায় আমি বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম যবদ্বীপের দিকে। সেখানে মলয় উপকূলে এক সামুদ্রিক ডাকাত আমার একটা পা ছিঁড়ে নিল। ভাগ্যিস, মলয়বনে চন্দন সস্তা, তাই আসল পায়ের চেয়েও দামি, চন্দনকাঠের এই মূল্যবান পদ আমি লাভ করেছি।—"

"তুমি তো মরতেই যাচ্ছ। যখন তোমার অন্তিমক্ষণ এসেছে তখন শেষ পর্যন্ত তোমাকে মরতেই হবে। যদি কিছু না মনে কর তা হলে স্মরণচিহ্নস্বরূপ তোমার পা থেকে একটুখানি আমি কেটে নিতে চাই। আমার এক পিসির ভারি পুজো-আর্চার বাতিক, তিনি পেলে খুব খুশি হবেন। কেটে নিলে তোমার লাগবে না তো?" কান্তি জিজ্ঞেস করে।

"পায়ে লাগবে কি না জানি না। তবে মনে লাগবে। কত কষ্ট করে এই পা বানানো।" কালু জানায়।

"তবে থাক, থাক। দরকার নেই।"

"এইবার আমি সেদিনের ঘটনায় আসব। কিছুদিন আগেকার সেই ঘটনায়। আমার কাহিনীকে আর অযথা বাড়াতে চাই না। থরহরিবাবুর বোধহয় খাবার সময় হয়েছে, খিদেয় ছটফট করছেন মনে হচ্ছে। এবার এক কথায় সেরে ফেলব। জাপানি আক্রমণ শুরু হতেই—তিন বছর আগের কথা বলছি—আমরা মলয় থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রওনা দিলাম। তারপর এই আড়াই বছর ধরে নানা দেশের নানান উপকূলে ভিড়ে নানাবিধ জীবনযাত্রা দেখে অবশেষে একদিন এডেন হয়ে আমাদের জাহাজ করাচির বন্দরে এসে পৌছল।"

"আমরা জানতাম।" বলল কান্তি।

"আপনাদের অজানা কী আছে? গোয়েন্দারা কী না জানেন? তারপর যা বলছিলাম। করাচিতে জাহাজ এলে আমি কিছুদিনের ছুটি নিলাম। ছুটি নিয়ে রেলে চেপে এসে পৌছলাম কলকাতায়।..."

"আসবার পথে কী তুমি কাশী হয়ে এসেছিলে নাকি?" কান্তি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে।

"কাশী? না তো! কাশী হয়ে আসিনি—এসেই কাশি হল। এই মারাত্মক কাশিটা।...তারপর যা বলছিলুম।... কথা ছিল, করাচি থেকে আমাদের জাহাজ কলকাতার ডেকে যেমন এসে পৌছবে, তেমনি আমারও ছুটি ফুরোবে। আমি এখান থেকেই জাহাজে আমার কাজে যোগ দেব। আমি দেখলাম, এই সুযোগ।—"

"খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করবার। তা-ই না?" কান্তিও যোগ দেয়।

"ঠিক ধরেছেন।...কলকাতায় আমার ভূতপূর্ব বাড়িতে ফিরলাম বটে, কিন্তু কী গেছলাম আর কী এলাম! তিক্ত মন, আশাহীন জীবন, দেহের ভগ্নাবশেষ নিয়ে আমার সেই কাকাকে এবার নিকেশ করে যাব।"

আবার দ্বিতীয়বার কাশিটা এসে ধমক দিতে লাগল কালুকে। কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে পড়ল বেচারা। থরহরি আর কান্তি উভয়ে উভয়ের দিকে কটাক্ষ করলেন যার মর্ম হচ্ছে, লোকটা কী শেষ কথা বলার আগেই বলা শেষ করবে? খকখকানি যে আর থামে না!

পনেরোর কিস্তি : কাশির উপসংহার

কাশির ধমকানি শেষ হলে কালু সেনের শুরু হল :

"সন্ধের পরে অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এলে আমি কাকার বাড়ির মাটিতে পা দিলাম। রাত তখনও বেশি হয়নি, কিন্তু কাকার প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের টিকি দেখা গেল না। তাতেই বুঝলাম কাকা বেরিয়েছেন। কাকা বাড়ির বাহির হলেই উদ্ধবের পাড়া-বেড়ানো আরম্ভ হয়। কাকা বাড়ির গাড়িতে বেরোননি বোঝা গেল, কেননা গাড়ি ঘোড়ারা আস্তাবলেই ছিল, কিন্তু তারা থাকলেও সহিস কোচম্যানরা ছিল না। একটা ঘোড়া আমাকে দেখে চিনতে পারল কী না জানি না, কিন্তু হ্রেষারবে সেই আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানাল।

"সদর-দরজা খোলাই পড়ে ছিল, ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে সেই পথেই বাড়িতে ঢুকতে পারতাম। কিন্তু যে খুন করতে এসেছে তার ওভাবে গৃহপ্রবেশের কোনো মানে হয় না। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কাজ সারাই তার উপাদেয় বলে মনে হয়। কিন্তু কাকার বাগানবাড়ি নামেই বাগানবাড়ি, বাগান সেখানে নামমাত্র, ঝোপঝাড়ের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু যেখানে ঝোপঝাড় নেই, আর যখন সদর-দরজা খোলা, এবং কেউ নেই কোথাও, তখন কী করি? অগত্যা আমার কাঠের পায়ের সাহায্যে বাধ্য হয়ে আমাকে দেয়াল বেয়ে উঠতে হল। অসাধারণ সাহসে ভর করে তাই উঠলাম। তা ছাড়া পথ ছিল না। দোতলা পর্যন্ত উঠে একটা জানালা পাওয়া গেল কাকার বিলিয়ার্ড-ঘরের জানালা। জানালার কারনিশে বসে অসাধারণ কৌশলে তার ভেতরের খিলটা খুললাম। কৌশলটা আর কিছু না, ছুরি দিয়ে খড়খড়ি দু ফাঁক করে হাত গলিয়ে ভেতরের ছিটকিনিটা খুলে ফেলা। ইচ্ছে করলে সদর দরজা দিয়ে অনেক আগে বিলিয়ার্ড-ঘরে পৌঁছে ভেতর থেকেই জানালাটা খুলতে পারতাম—ঢের সহজেই। কিন্তু কারনিশে বসে খোলাটাই অসাধারণ। অন্যভাবেও খোলা যেত বটে, কিন্তু কাজটা খেলো হয়ে যেত। পরদিন সকালে পুলিশের লোকেরা এসে কিসের এত অনুসন্ধান করত তা হলে? ক্লু খুঁজত কোথায়? অনুসন্ধান করবার মতো কিছু না পেলে তারা বিরক্ত হত না কি? ভাবত যে আমি তাদের হতাশ করেছি, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি, আমার উপযুক্ত কাজ আমি করিনি। মনে-মনে তারা টিটকিরি দিত আমাকে। এইসব দিকে দৃষ্টি রাখা দায়িত্ব-জ্ঞানী হত্যাকারীর কর্তব্য। ভালোবাসার পথ যেমন অত্যন্ত সোজা, সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছে করে আমরা তাকে ঘোরালো করে তুলি, তেমনি খুনখারাপির পথও। তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ না থাকলে কিছুই থাকল না। কোনো মারপ্যাঁচ না করে যদি মারা যায়, মারলেও সেটা মারা হল না। খুনের অভিধানে সেটা অপকর্ম।—"

কান্তি হাঁ করে কালুর মুখ থেকে এই হত্যাতত্ত্ব শুনছিল—থরহরি তাদের দুজনকেই বাধা দিলেন। "ঢের হয়েছে। এখন আসল কথা শুনি।" তিনি বললেন। এইবার নিয়ে তিনবার।

রান্নাঘর থেকে ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ এসে অনেকক্ষণ থেকে তাঁকে বিচলিত করছিল না বলে তিনি থাকতে পারলেন না।

"জানলা খুলে ফেলে তার পরে আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা নামালাম। খুনের নেশায় বুকের রক্ত তখন টগবগ করছে আমার। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে খুব বাঁচিয়েছেন। খুন আমাকে করতে হয়নি—"

"এঁ্যা, এই যে বললে তুমিই করেছ? এখন আবার—?" কান্তি চেঁচিয়ে ওঠে।

"এখনও আমি কিছুই বলিনি। করেছি কী করিনি, আমার কাহিনী শেষ হলে আপনারাই তার বিচার করবেন। করেছি কী করিনি আমি নিজেও জানি না। আমি নিজেও তা জানতে চাই। আপনাদের কাছ থেকেই জানতে চাই। আপনারাই তার বিচারক।"

"আহা, বলতেই দাও-না ওকে। তুমি আবার কেন বাধা দিচ্ছ?" বাধা দিয়ে থরহরি স্বয়ং এবার বলেন। বলেন কান্তিকেই।

"হ্যাঁ, যেমনি-না আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা দিয়েছি—তক্ষুনি সেই ঘরের বিজলিবাতি জ্বলে উঠল আর আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম—না, কাকে দেখতে পেলাম তা আমি বলব না—তা আপনারা আমাকে খুনই করুন আর যা-ই করুন—সেই দেবীর বর্ণনা আমার এই পাপমুখে আমি করব না। সেই দেবী

বললেন—দেবীদের অজানা কী আছে? সকলের নাড়ির খবর তাঁদের হাঁড়িতে—দেবী বললেন আমায়—'পিলটু!'—আদর করে ওই ডাকনাম তিনি দিয়েছিলেন আমাকে—বললেন আমায়—'পিলটু, বুঝতে পেরেছি। তোমার কাকাকে তুমি খুন করতে এসেছ। ও-কাজ কোরো না।' দেবীর ওই কথায় আমার মন ঘুরে গেল, কেমন ঘুরে গেল। মত বদলে গেল আমার। আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম, ঠিক যেমন করে—যেমন করে—"

ভাষায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে কালু সেনকে থামতে হয়।

থরহরি দাড়ি চুলকান।

"ঠিক যেমন করে হাবারা কাঁদে।" কান্তি বাতলে দেয়। "তারপর বলে যাও।"

"কান্নাকাটি শেষ হলে, নিচে থেকে কাকার গলার আওয়াজ এল। 'চটপট—' বললেন সেই দেবী, 'চট করে' কোথাও লুকিয়ে পড়ো। উনি যেন তোমায় না দেখতে পান।' এই বলে দেবী পাশের একটা ঘরে পালিয়ে গেলেন। আমি চারধারে তাকিয়ে কেবল একটা তাক দেখতে পেলাম। বেশ বড়সড় তাক—পর্দা দিয়ে ঢাকা। পর্দার আড়ালে কোনোরকমে তার মধ্যে গুড়িসুড়ি মেরে লুকিয়ে থাকা যায়। আমি সেই তাকে গিয়ে উঠলাম। কী করে উঠলাম বলব?"

"না। নিজেই আমি মাথা ঘামিয়ে বার করতে পারব।" কান্তি জবাব দিল : "যদ্দূর মনে হয়, তোমার ওই কেঠো পা দিয়ে এক লাফে গিয়ে উঠে দাঁড়ালে?—অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যেই—তা-ই না?"

কালু সেন জবাব দিল পা নেড়ে—সেই কেঠো পাখানাকেই নেড়েচেড়ে জানাল যে তা-ই বটে।

ষোলোর কিস্তি : রহস্যভেদ

"পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কী হয়। কাকা এলেন, থরহরিবাবু এলেন। কাকা বললেন, এসো থরহরি, একদান খেলা যাক।

"থরহরিবাবু জানালেন যে তাঁর আপত্তি নেই। একপেট খাওয়ার পর বিলিয়ার্ড খেলায় নাকি হজমের সাহায্য করে। এই নাকি তাঁর ধারণা।

"তারপর দুজনের খেলা শুরু হল।

"আমি ওঁদের খেলা লক্ষ করতে লাগলাম। পর্দায় একটা ছেঁদা ছিল। তার ভেতর দিয়ে নিজে অদৃশ্য থেকেও সমস্ত কিছু দিব্যি দেখা যায়—"

কান্তি বলল—"হ্যাঁ, পরদার ছেঁদাটা আমি দেখেছিলাম বটে। যদিও ছেঁদার ভেতর দিয়ে কতদূর দেখা যায় না যায় লক্ষ করতে যাইনি।"

"ওই তো গোয়েন্দাদের গলদ। আসল লক্ষ্য ফেলে উপলক্ষের পেছনে আপনারা ছোটেন। যা-ই হোক দেখতে লাগলাম খেলাটা—কিন্তু খেলা আর শেষ হতে চায় না। এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা টনটন করতে লেগেছে। খেলতে খেলতে দুজনেই খুব মেতে উঠলেন—এবং দেখতে দেখতে তেতে উঠলেন দুজনেই। অবশেষে ওই খেলা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল দুজনের। থরহরিবাবু হেরে গেছলেন।" কালু ফাঁস করে দিল।

থরহরিবাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন, "সে যে শাদা বলটাকে—" তার বেশি

তিনি আর বলতে পারলেন না। এতদিন পরেও সেই কথা ভাবতে গিয়ে ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

"ঠিক কথাই।" বলল কালু : "আমার কাকা লাল বলটা মারতে পারেননি। তাঁর ফসকে গেছল। কান্তিবাবু, সমস্ত বিলিয়ার্ডের গবেষণাই তোমার ভুল। আগাগোড়াই গলতি। বিলিয়ার্ড খেলায় কেউ শেষ পয়েন্ট নিয়ে ব্যস্ত হয় না। তখনও টেবিলে দুজনেরই নিরানব্বই। থরহরিবাবু টেবিল ছেড়ে চলে গেছেন। আমার কাকা তার পরও লাল বলটাকে মারবার তাক করতে লাগলেন- একলা একলা সব বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়ই যা করে। আধখানা মারে বলটাকে টপকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের পকেটস্থ করা—এই চেষ্টাই তিনি করতে লাগলেন বারংবার। কিন্তু কিছুতেই পারছিলেন না। কতরকমভাবে তিনি করলেন। কিন্তু কিছুতেই বলটাকে কাবু করতে পারলেন না।"

"এই চেষ্টায় ক্রমশ তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন বোধহয়?" কান্তি জিজ্ঞেস করল। খুঁটিনাটির দিকে তার খর নজর।

"মোটেই না।...অবশেষে তিনি করলেন কী...আমি সেই পরদার ছিদ্র ভেদ করে দেখতে লাগলা—অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে গলায় জড়ালেন, ফাঁসের মতো করে জড়ালেন, আর সেই ফাঁসের মধ্যে বিলিয়ার্ডের কিউটাকে রাখলেন। 'এইবার বোধহয় আমি পারব।' তিনি বললেন এইবার।"

"হ্যাঁ, এবার আমি বুঝতে পারছি।" বলল কান্তি।

"হ্যাঁ, এবার পারবেন।" কালু বলল, "গলায় কিউ বেঁধে বলটার পশ্চাতে এবার তিনি লাগলেন। খুব উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত, বুঝতেই পারছেন। খেলা দেখতে দেখতে আমিও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কোথায় আছি, কী অবস্থায় আছি, কিছুই আমার মনে ছিল না। কাকার মারটা দেখবার জন্য পরদা ফাঁক করে ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেছি—আমার কাকা তাক করছেন আর আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে—দুজনের এই তাকাবার মুহূর্তে তাক থেকে আমার পা ফসকে গেল। কাকা ছিলেন ঠিক আমার সামনেই, আমি তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। কাকাও পড়ে গেলেন। আমাকে নিয়ে তিনি পড়লেন। পড়লেন মেজেয়।"

"এখন দেখা যাচ্ছে।" বলল কান্তি : "উপুড় হয়ে তিনি পড়লেন আর তাঁর মাথা ঠুকে গেল মেজেয়। আর গলার ফাঁসে আর কিউয়ে আটকে গিয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটল। বিলিয়ার্ডের লাঠি আর রুমালের ফাঁস—এরাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। এখন বুঝতে পারছি।"

"হুবহু তা-ই।" কালু জানাল। "তারপর যখন আমি এই দৃশ্য দেখলাম, দেখলাম যে তিনি অক্কা পেয়েছেন, আর একদণ্ডও সেখানে দাঁড়াবার আমার সাহস হল না। কিউটাকে ছাড়িয়ে এনে কাকার গলার ফাঁসটা আর ভালোভাবে আমি এঁটে দিলাম। তাঁর হাত দুটো স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইলে সাজিয়ে দিলাম। ওই স্টাইলটা আমার খুব ভালো লাগে। ওতে বুকে জোর পাওয়া যায়। তারপর যেমন এসেছিলাম তেমনি বেমালুম সে-স্থান থেকে আমি প্রস্থান করলাম।"

"তেমনি দেয়াল বেয়ে? না জানালা ডিঙিয়ে?" কান্তি প্রশ্ন করল।

"না, এবার সদরপথেই। খুন করলে অবিশ্যি অন্য পথ নিতে হত।"

"কিন্তু পিন দিয়ে তোমার কাকার বুকের কাছে গাঁথা সেই কাগজখানা? যাতে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার তোমার নামে উইল করে দেয়া হয়েছে—সেটার কথা তো কিছু বললে না হে?"

"কী কাগজ? কই, আমি তো তার কিছুই জানি না। তেমন কিছুই তো আমি

লিখিনি। সেসব লেখবার কথা আমার মনেও ছিল না। আমি তখন সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।"

"তুমি না লিখলে কে আবার তবে লিখবে? তবে কী আমি লিখেছি?" কান্তি এবার চটে যায়, তার ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই বোধহয়।

"তা হলে—তা হলে কী সেই দেবী—সেই দেবীই কী?" —কালু সেন এই পর্যন্ত বলেই থেমে যায়।

"তা হতে পারে। দেবীদের অসম্ভব কিছুই নেই।" থরহরি বলেন : "দেবীদের রহস্য দেবতারাও টের পান না।"

"তোমার কাকার ওইভাবে মারা যাওয়াটা দৈব-দুর্ঘটনা হতে পারে—কিন্তু ওই কাগজের লেখাকে আমি দেবী-মাহাত্ম্য বলে মানতে প্রস্তুত নই।" কান্তি বলে।

"কালু, গল্পটা তুমি বানিয়েছ মন্দ নয়।" কিছুক্ষণ ভাবিত থেকে থরহরিবাবু বলেন : "এ-পর্যন্ত যত খুনের কেচ্ছা আমার কাগজে বেরিয়েছে, তার সবকটাকে টেক্কা দিয়েছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তোমার গল্পের এক জায়গায় গলদ আছে—একটা কথা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। তোমার কাকার গায়ে যে দুটি বুলেটের দাগ দেখা গেছে—তার মানে? গুলির ওই গর্ত দুটো এল কোত্থেকে?"

"সাবেক কালের গর্ত। বহু পুরনো।" কালু ধীরে ধীরে বলে, "বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে, কিন্তু না বলিয়ে আপনারা ছাড়লেন না। বড়লোক হবার আগে আমার কাকা একজন বড়দরের গুন্ডা ছিলেন। গ্যাঁড়াতলার গুন্ডার সর্দার ছিলেন তিনি। সেই সময়ে পুলিশের অনেক গুলি তাঁকে হজম করতে হয়েছে। পুলিশের হাত ছেড়ে পালাতে গিয়ে কতবার যে তিনি গুলি খেয়েছিলেন তার ইয়ত্তা ছিল না। তাঁর সারা দেহ অমন অনেক গুলিতে ঝাঁঝরা। বয়েস বেশি হয়ে গেলে আর অত ঝক্কি নেয়া তাঁর পোষাল না। অত ঝক্কি নিয়ে অর্থোপার্জনে শেষ পর্যন্ত মজুরি পোষায় না। তারচেয়ে সোজাসুজি আইনসঙ্গত উপায়ে টাকা কমানোর দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি বললেন, কেন, আইন বাঁচিয়ে কী চুরি-ডাকাতি করা যায় না? আইনের জোরে কী না হয়? এবং তার পরই তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়ে গেলেন। তিনি বলতেন, গুন্ডার সর্দারির চেয়ে কর্পোরেশনের সর্দারিতে বেশি লাভ, অথচ প্রায় একই ব্যাপার নাকি, একই ওস্তাদির রকমফের কেবল। এমনকি তিনি আরও বলতেন যে, চোর শুধুই চোর, গাঁটকাটা কেবলই গাঁটকাটা, গুন্ডা গুন্ডাই কেবল, কিন্তু এদের সকলের গুণ একত্র করলে, চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ি এবং গুন্ডামি এক জায়গায় জড়ো করলে যে-বস্তু নিজ গরিমায় দেখা দেয় তা-ই হচ্ছে নাকি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। কর্পোরেশন থেকে লাটের দরবারে এমনকি বড়লাটের খাস কাউন্সিলে যাবার পর্যন্ত তাঁর লোভ হয়েছিল। সেসব জায়গার ব্যাপার নাকি আরও বড়দরের, তিনি বলতেন। কিন্তু সে-বাসনা চরিতার্থ করবার তিনি আর সুযোগ পেলেন না। আমার মুহূর্তের পদস্খলনের জন্যই সে-আকাঙ্ক্ষা তাঁর অপূর্ণ থেকে গেল।" কালু সেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল এই বলে।

"একেই বলে একের পাপে অন্যের পতন।" কান্তি মিত্রের মন্তব্য শোনা যায়।

কালু সেন নীরব। সকলেই চুপচাপ, কারও মুখে কথাটি নেই।

অবশেষে কালুই স্তব্ধতা ভাঙল :

"মশাইরা, আমার সময় খুব কম। (আবার এক কাশির ধাক্কা এসে পড়ল।) আমার মনে হয় আমি ভেঙে পড়ছি, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছি। মৃত্যুমুখেই উপনীত হয়েছি বোধহয়। থরহরিবাবুর বাড়িতে মারা পড়ে তাঁকে আবার নতুন

আরেক দায়ে জড়াতে আমি চাই না। যেটুকু অল্প সময় এখনও আমার আছে তার মধ্যেই এখান থেকে কোনোরকমে এই মুমূর্ষ দেহকে টেনে হিঁচড়ে আমি চলে যেতে চাই। কিন্তু নির্দোষ এবং কলঙ্কমুক্ত হয়ে এখান থেকে আমি যেতে পারি কী না সেই কথাই আমি জানতে চাইছি।"

"তুমি নির্দোষ এবং নিরপরাধ।" থরহরিবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন।

শেষ কিস্তি : কিস্তিমাত

কালু সেনের কলঙ্কমোচনের পর কয়েক দিন কেটেছে। এই কদিন ধরে কান্তি মিত্র কেবলই ভেবেছে কী করবে। মিত্রতার পরিধি আরও বাড়াবে কি না এই ছিল তার প্রশ্ন, অবশেষে আজ সকালে কাঁচির কাপড়ের উপরে সিলকের পাঞ্জাবি চড়িয়ে, সর্বাঙ্গে অগুরু ছড়িয়ে নিয়ে গুরুতর সমস্যাটার মুখোমুখি হবার মতলবেই সে বেরিয়ে পড়ল। সমস্যাটা দেখতে যখন সুশ্রীই, অন্তত আপাতদর্শনে এমন কিছু অরুচিকর নয়, তখন তার সামনাসামনি হতে পেছপা হবার কী আছে? প্রয়োজনই বা কী? এই কথাই কান্তি ভাবল।

এবং এই ভেবেই সে অলকা দত্তর দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু তখনও তার ভাবনা তাকে ছাড়েনি। কড়া নাড়বে কী নাড়বে না? কড়ার আওয়াজ করা উচিত হবে কী? এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখনও।

কান্তি মিত্র সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল—ভাবতে ভাবতে। "এই যে কাজ করতে যাচ্ছি, এর পরিণামে আমার ভাবী জীবন কী সুখময় হবে?" এই কথা সে জিজ্ঞেস করেছে। পুনঃপুন, নিজেকেই।

"ভেবে দেখলে আমি কৃত্তিবাসের চেয়ে বেশি হঠকারিতা করতে চলেছি। সে নিজের গলায় বিলিয়ার্ডের কিউ বেঁধেছিল, আর আমি জলজ্যান্ত একটা মানুষকে আমার গলায় বাঁধতে যাচ্ছি? ভালো করছি কী না জানিনে।" কান্তি চিন্তা করে।

"আস্ত একটা মানুষকে গললগ্ন করে সংসারসমুদ্রে সাঁতার দেয়া কী আমার পক্ষে সম্ভব হবে? খোদাই জানেন!" এই কথাও ভেবেছে কান্তি।

"নাঃ, আর ভাবব না। কৃত্তিবাস যদি একজনের গলায় ফাঁস লাগাতে পারে—তা হলে আমি কেন দুজনের গলায় লাগাতে পারবে না? সে নিজের গলায় লাগাতে পারল আর আমি পারব না? আমি কী তার চেয়েও ভীতু? তার চেয়ে কী কোনো অংশে কম আমি?"

"না, আমি তেমন কাপুরুষ নই!" অবশেষে এই স্বগতোক্তি করে কান্তি মিত্র উঠে পড়েছে। সিঁড়ি থেকে উঠে কড়া বাজিয়েছে দরজার!

দরজা খুলে যেতেই জিজ্ঞেস করেছে : "অলকা দেবী আছেন?"

একটি আধাবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। "অলকা কালকে এখান থেকে চলে গেছে।"

"চলে গেছেন? কোথায়?"

কান্তি মিত্রর মনে হয় আবার সে সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছে। নিজেকে ধরাশয়ী বলে তার ধারণা হয়।

"তা তো বলতে পারব না।" উত্তর এসেছে মেয়েটির কাছ থেকে।

"আপনি কে? আপনি কী এখানকার—?" কান্তি জিজ্ঞেস করে।

"আমরা এই বাড়ির অন্য ভাড়াটে। অলকার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আপনি কী কান্তিবাবু? সেইরকম যেন মনে হচ্ছে। যদি তা-ই হয় তা হলে আপনার নামে একটা চিঠি আছে। অলকার চিঠি। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।"

চিঠিটা নিয়ে কান্তি মনে-মনেই পড়ল।

"প্রিয় কান্তিবাবু,

পিলটু আর আমি গতকল্য তিন আইন মতে পরস্পরকে বিবাহ করেছি। পিলটুকে চিনতে পারবেন আশা করি। তাঁর ভালো নাম হচ্ছে কালু সেন। আমরা আজ জাহাজে চড়ে এডেনের দিকে যাত্রা করব। আজ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ছে। এখান থেকে বসেরায় গিয়ে বাসা বাঁধবার বাসনা আছে।

আপনি শুনে সুখী হবেন পিলটুর কাশি এখন অনেকটা কম। চ্যাবনপ্রাশ খাওয়াচ্ছি—কল্পতরুর চ্যাবনপ্রাশ। কাশীর পেয়ারা খেলেও সারত, কিন্তু তা আর পাচ্ছি কোথায়? তবে বোগদাদের আঙুর খেলে সেরে যাবে আশা হয়।

আরও সুখের বিষয়, কৃত্তিবাস সেনের অ্যাটর্নিক তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিলটুকে দিতে ইতস্তত করেননি। কেননা যে- কাগজখানা নিহত কৃত্তিবাস সেনের বুকে আঁটা দেখা গেছল সেটা কৃত্তিবাসবাবুরই নিজের হাতের খসড়া—অনেকদিন আগেকার রচনা। খসড়াটা তাঁর কোন দেরাজে ছিল আমি জানতাম। আমিই ওটা বার করে এনে তাঁর জামায় এঁটে দিই—তিনি দেহরক্ষা করবার পর। পিলটুর মুখ চেয়েই এ-কাজ করেছিলাম, বোধহয় অন্যায় করিনি।

যা-ই হোক, ওই খসড়া আমার মামাশ্বশুরের স্বহস্তলিখিত বলে অ্যাটর্নিক শনাক্ত করেছেন। তা ছাড়া ওই খসড়ার আরেক কপি রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে তাঁদের দপ্তরেও ছিল তাও জানা গেছে।

পিলটু কৃত্তিবাসদত্ত নিজের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকাটা বসোরার ঠিকানায় পাঠাবার ভার অ্যাটর্নিদের দিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায়, এই কাজের জন্য অ্যাটর্নিরা নিজেদের প্রাপ্য ফিস কেটে নিলেও তাঁদের কাছ থেকে ষোলো আনার এক আনা ভাগও, ভাগ্যে থাকলে, কোনো-না কোনো সময়ে আমরা পাব। সেই আমাদের যথেষ্ট।

আমাদের দুজনেই ধারণা, আপনার মতো গোয়েন্দা আর হয় না। পিলটু তো বলছে, আপনি না থাকলে সে আজ কোথায় দাঁড়াত?

ইতি—আপনার বিশ্বস্ত
অলকা দত্ত।

পুনশ্চ— একটা কথা আপনাকে বলতে ভুল হয়েছিল। বিলিয়ার্ড ঘরে যে পিলটুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সে কথা আপনাকে বলা হয় নি। কিন্তু তা না বললেও এ কথা আমি বারংবার বলব যে আপনার গোয়েন্দাগিরির তুলনা হয় না। সত্যিই আপনি অতুলনীয়।

ইতি—

[১৯৪৪]

www.murchona.com

Ke Hotyakari by Shibram Chakraborty

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com